সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রবন্ধ-পাঠ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ
প্রণীত।

Calcutta:

PUBLISHED BY KRISHNA MOHAN KUNDU
10/1 CORNWALLIS STREET,

AND

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAYA,

MOHAN PRESS.

8 SREENATH BABU'S LANE, COLOOTOLAH STREET.

1890.

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া "প্রবন্ধ-পাঠ" লিখিত হইল। ইহাতে নৈতিক, ঐতিহাসিক ও জীবন-বৃত্ত-বিষয়ক ১৯টী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দেওয়া গিয়াছে। যিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকালীন অপরিস্ফুট ও ক্ষীণকলেবর বাঙ্গালা ভাষার পরিস্ফোটক ও পরিপোষক, যিনি তৎকালোচিত বাঙ্গালা ভাষার দুর্গম ও জটিল পথ উন্মুক্ত করিয়া তাহা এক্ষণে সুগম ও সহজ করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানান্ধ বাঙ্গালী বালক-বালিকাগণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বহু প্রচারের অন্যতম কারণ, যিনি নিরাশ্রয়া বঙ্গ-বিধবার অশ্রুমোচন করিতে একদিন প্রাণ-সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মার জীবন-চরিত পাঠ না করিলে বাঙ্গালী সন্তানের প্রত্যবায় আছে ভাবিয়া এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনচরিত সন্নিবেশিত হইল। "প্রবন্ধ-পাঠ"-রচনার ভাষা প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিগণিত হইলে, এবং বালক বালিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও স্বীয় চরিত্র সংগঠন করিতে পারিলে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সার্থক ও পরিশ্রম সফল হইবে।

ভদ্রকালী
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ } শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ-পাঠ।

বিদ্যাশিক্ষা।

বিদ্যা অমূল্য ধন। তস্করে যাহা অপহরণ করিতে অসমর্থ, দায়াদগণ যাহার অংশ গ্রহণে অক্ষম, মহামূল্য মণিমুক্তাদির বিনিময়েও যাহা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, যথেচ্ছ ব্যয় করিলেও যাহার অণুমাত্র ক্ষয় না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং যাহা না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্য-পদ-বাচ্য নহে, তাহা অপেক্ষা মূল্যবান্ ও সারগর্ভ সামগ্রী জগতে আর কি আছে! বিদ্যার কি মনোহারিণী মূর্ত্তি! বিদ্বানের মুখমণ্ডল অনুপম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, হৃদয়ভাণ্ডার বহুমূল্য রত্নমালায় সুসজ্জিত, এবং চিত্ত-চকোর ইতর-প্রাণি-ভোগ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয় পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞান-কৌমুদীর জন্য প্রধাবিত। নিকৃষ্ট-সুখ-প্রয়াসী বিদ্যাহীনের চিত্ত-কুটীর যেরূপ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন থাকে, বিশুদ্ধ-সুখাভিলাষী বিদ্বানের চিত্ত-প্রাসাদ সেরূপ নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত হইয়া চির বিরাজ করিতে থাকে। বিদ্যা-ক্ষায় ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ, বিচারশক্তি মার্জ্জিত, চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত, মানসিক বৃত্তিসকল উত্তেজিত ও কুসংস্কার পরম্পরা

তিরোহিত হয়; এবং ভাবী সম্পদ্ ও বিপদ্ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তির ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্তির সবিশেষ ক্ষমতা জন্মে।

বিদ্যাশিক্ষা অশেষ সুখের নিদান। সাংসারিক কার্য্যজালে জড়িত ও উৎপীড়িত হইলে বিরলে বসিয়া শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অতি সুখে সময় অতিবাহিত করা যায়। সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ নিরন্তর অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্যভাবে পরিপূর্ণ। যাহা ইতর সাধারণের প্রত্যক্ষ হইলেও নেত্র-বহির্ভূত, তাহা তাঁহার অপ্রত্যক্ষ হইলেও বোধ-নেত্র-গোচর। তিনি ভূলোকবাসী হইয়াও আকাশমার্গে বিচরণ করিতে থাকেন। উত্তাল-তরঙ্গ-ময় বিশাল বারিধি-বক্ষঃ, তুষার-মণ্ডিত দুর্গম গিরিশৃঙ্গ, ভূগর্ভ-নিহিত অত্যাশ্চ ধাতুনিঃস্রব ও শূন্যদেশে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডল ইত্যাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হন। একাসনে বসিয়া কল্পনা বলে তিনি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিযা আসিতে পারেন, ও নেত্র-নিমীলন করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যকলাপ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পান।

বিদ্যা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বিনয, শিষ্টতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরম্পরা শিক্ষা দিয়া থাকে। কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ রাখিতে পারা যায়, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কিরূপে তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিতে হয়, কিরূপে পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দান করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা আত্মীয়, বন্ধু ও অপর সাধারণের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে তাহা সম্যক্‌রূপে

অবগত হওয়া সুকঠিন। বিদ্যাশিক্ষার অভাবেই পর্ণকুটীরাশ্রয়ী অসভ্য, বর্ব্বর জাতি, সুরম্য-প্রাসাদ-নিবাসী, সুসভ্য, নাগরিক লোক অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও হিনাবস্থ। বিদ্যাবলে সভ্য জাতীয় লোকেরা সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাষ্পীয়পোত, বাষ্পীয়রথ ও ব্যোমযান প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে বিচরণ করিবার কত দূর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, দিগ্দর্শন, তাপমান, বায়ুমান ও তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বিজ্ঞান-যন্ত্র সকল আবিষ্কৃত করিয়া দুঃসাধ্য বিষয়ও সুসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন; বস্ত্রযন্ত্র, গোধূম-যন্ত্র, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি কত শত শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মানব মণ্ডলীর মহোপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন; সেতু, সুরঙ্গ, প্রণালী ও প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মূর্খ ধনী পরম ধনে বঞ্চিত। সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, অলঙ্কৃত হইলেও নিরলঙ্কার। সুবেশ-পরিধায়ী মূর্খ দূর হইতে সুন্দর, কিন্তু নিকটে আসিলেই কুৎসিত দেখায়। অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ-পরিপাটীর গর্ব্ব করিলে চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি সুদৃশ্য বস্ত্র ও সুরম্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া আপনাকে বড় জ্ঞান করে, ও অন্যকে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হয়, সে অতি অসার। এরূপ লোক কাহারও আদরণীয় নহে, এবং সারবান্ লোকেরাও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পরাঙ্মুখ হন। যদি ও ধনলোভী স্তাবকেরা

স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষে তাহার যশোগুণ কীর্ত্তন করে, তথাপি পরোক্ষে তাহার নিন্দা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ধনোপার্জ্জন বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা কখনই বিদ্যার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতএব কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি নর, কি নারী সকলেরই এতাদৃশী সর্ব্বহিতকারিণী বিদ্যাশিক্ষার অনুশীলন করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

শাস্ত্রচর্চ্চা ও জ্ঞানলাভ।

জ্ঞানই বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ও শাস্ত্রচর্চ্চার চরম ফল। জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গুরুতর সামগ্রী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নিরন্তর শাস্ত্রপাঠ করিলেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এরূপ নহে; ঔষধ সুসেবিত না হইয়া কেবলমাত্র নামোচ্চারিত হইলেই রোগের উপশম হইতে পারে না। নীতিজ্ঞ হইয়া নীতি-জ্ঞের অনুরূপ কার্য্য না করিলে নীতি-শাস্ত্র-পাঠ বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা নীতি-শাস্ত্র-পাঠ করিয়া নীতি-বাক্য গুলি কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহারাই যথার্থ বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্। জ্ঞানবৃক্ষ হৃদয়ে অঙ্কুরিত, জিহ্বায় পুষ্পিত ও কার্য্যে ফলিত হইয়া থাকে। যাহা ন্যায্য তাহার সম্যক্ জ্ঞান ও পরিগ্রহণ, এবং যাহা অন্যায় তাহার নির্ব্বাচন ও পরিবর্জ্জন করাই জ্ঞানোৎপত্তির প্রথম পরিচায়ক। যাহার কার্য্য কথার অনুরূপ, যিনি স্বল্পমূল্যে চিরনির্ম্মল ও চির-স্থায়ী সুখ ক্রয় করিতে পারেন, যিনি ধনী হইয়াও নম্র ও দরিদ্র হইয়াও উন্নত, এবং দুর্বৃত্ত ষড়রিপু যাঁহাকে কখনও অভিভূত

করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। আত্ম-সংযম-শক্তি যাঁহার বলবতী; অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অনন্ত অধ্যবসায় যাঁহার নিত্য ও প্রিয় সহচর; যিনি সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও কার্য্যকুশল; এবং পরনিন্দা, পরদ্বেষ, পরধনাপহরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মগুলি যাঁহার নিকট কখনও স্থান লাভে সমর্থ নহে, তিনিই যথার্থ জ্ঞানবান্।

শাস্ত্রচর্চ্চা এক প্রকার নির্ম্মল ও অনির্ব্বচনীয় আমোদ। অবস্থা-বৈগুণ্যে পড়িয়া মন বিরক্ত ও উৎপীড়িত হইলে নির্জ্জনে বসিয়া গ্রন্থপাঠ দ্বারা অতি সুখে সময় ক্ষেপ করা যাইতে পারে। বাক্‌পটুতা শাস্ত্রপাঠের অন্যতম ফল। নানাবিধ গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে যুক্তি ও সূক্তি সম্বলিত বচন-পরিপাটী দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মন দ্রবীভূত করিয়া যে কোন বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত, উত্তেজিত ও প্রণোদিত করা যাইতে পারে। বক্তৃতা-কালে প্রস্তাব্য বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা এবং তাহা রূপক ও উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা পাণ্ডিত্য-প্রকাশ-মাত্র। বিচারকালে কথায় কথায় শাস্ত্রীয় উদাহরণ প্রদর্শন করাও অবিজ্ঞের কার্য্য। শাস্ত্রানুশীলনে বুদ্ধিশক্তি পরিমার্জ্জিত ও বিচারশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়।

অর্থোপার্জ্জন শাস্ত্রচর্চ্চার চরম ফল নহে; উহা তাহার অবান্তরমাত্র। ধূর্ত্ত, মূর্খ ও নাস্তিকেরা শাস্ত্রে দ্বেষ ও অশ্রদ্ধা করে; সরলচিত্ত লোকেরা তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদন করেন।

মর্ম্মগ্রহণে অন্ধ হইয়া পুস্তক পাঠ করা অবিবেচনার কর্ম্ম

বিরলে বসিয়া পরিচিন্তন না করিলে তাহা ফলোপধায়ক নহে। সময়ে সময়ে সাংসারিক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও বিজ্ঞ হইতে হয়। কারণ, জগতের ব্যবস্থা ও ব্যবহার দেখিয়া আমরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

শাস্ত্র নানাবিধ। তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল স্বাদগ্রহণ করিতে হয়; কতকগুলি উদরস্থ করিতে হয়; কতকগুলি বা চর্ব্বিত, রোমন্থিত ও জীর্ণ করিতে হয়। অর্থাৎ কতকগুলি অংশতঃ পাঠ করিতে হয়; কতকগুলির আদ্যন্ত পাঠ করা আবশ্যক; এবং কতকগুলি প্রগাঢ় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও তাহার অর্থবোধ করা সবিশেষ কর্ত্তব্য। এরূপ কতকগুলি পুস্তক আছে যে কেবলমাত্র তাহার সার সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীস্থ গ্রন্থ সকল মূল দেখিয়াই পাঠ করা উচিত। পরিস্রুত জল ও পরিস্রুত পুস্তক উভয়ই তুল্য, কারণ উভয়ই বিস্বাদ ও অতৃপ্তকর।

বহুজ্ঞতা-লাভ শাস্ত্রানুশীলনের অন্যতম ফল। নানাশাস্ত্র পাঠে বহুদর্শী হয়, অন্যের সহিত আলোচনা করিলে উপস্থিত বক্তা হয় এবং রচনাশক্তির বিলক্ষণ পরিপুষ্টি জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিলে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হয়, বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার ফলও সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। পুরাবৃত্ত-পাঠে বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা জন্মে। সাহিত্য-পাঠে বচন-চাতুর্য্য ও রচনা-নৈপুণ্য লাভ হয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্র-পাঠে গাম্ভীর্য্য এবং নীতি-শাস্ত্র-পাঠে সুশীলতা ও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে। তর্ক-শাস্ত্র-পাঠে বাদ-নৈপুণ্য ও বিচার-শক্তির সম্যক্ উন্মেষ হয়। চপল-চিত্ত

ব্যক্তির গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা আবশ্যক। গণিতের প্রক্রিয়ায় কিছুমাত্র ভ্রম হইলেই প্রতিজ্ঞা-উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং তৎকালে পুনর্ব্বার তাহা মূল হইতে আরম্ভ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে চিত্তচাপল্য দূরীভূত হইয়া একাগ্রতা সংসাধিত হয়। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। তর্কবিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সূক্ষ্মানুসন্ধান প্রযুক্ত বুদ্ধির স্থূলতা ও জড়তা নষ্ট হইয়া যায়। ব্যবহারশাস্ত্রে অধিকার থাকাও বিলক্ষণ আবশ্যক। কারণ, উহা অত্যন্ত উপযোগী। উহাতে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভিমত বিষয় প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

আত্মাবলম্বন।

পর-সাহায্য না লইয়া আপনার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করার নাম আত্মাবলম্বন। যাহার আত্মাবলম্বন নাই, যে সর্ব্বদাই পর-প্রত্যাশী, যাহার আলস্যে অনুরাগ ও শ্রমে বিরাগ, যে বিপদে অধীর ও অভাবে অসহিষ্ণু, যাহার প্রত্যেক কার্য্যেই শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য, এবং যে পদে পদে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ কাপুরুষ। আত্মাবলম্বনই সমুন্নতিলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। উহার ফল যেরূপ সুমধুর,সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর,পরাবলম্বনের ফল কখনই সেরূপ নহে। আত্মাবলম্বন মনুষ্যকে যেরূপ সাহসী, উৎসাহী ও কার্য্যকুশল করিয়া তুলে,পরাবলম্বন সেরূপ সাহসহীন, নিরুৎসাহ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। যে পরিমাণে অন্য-

দীয় সাহায্য গ্রহণ করা যায়, সেই পরিমাণেই আত্মনির্ভরশক্তি হীয়মান হইয়া পড়ে। যাহারা আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া পরশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, তাহারা ক্রমে ক্রমে জড়পিণ্ডবৎ এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, অন্য কর্ত্তৃক চালিত না হইলে এক পদও চলিতে পারে না। পর-প্রত্যাশীর ন্যায় দুর্ব্বল ও হীনচেতা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা আশ্রয় পাইলেই দাঁড়াইয়া থাকে ও নিরাশ্রয় হইলেই পড়িয়া যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা নিস্তেজ, ও হতভাগ্য জগতে আর কে আছে! ক্ষমতা স্বত্বেও যাহারা আত্ম-নির্ভর না করিয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত অসার ও যথার্থ নরাধম।

পর-প্রত্যাশী হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। আত্ম-নির্ভর-শক্তি যাঁহাদিগের বলবতী, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। সংসারে যত লোক হীনাবস্থা হইতে সমুন্নত অবস্থায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মাবলম্বী। জগতে যাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রলিপ্ত থাকিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কি বাহুবলে কি বুদ্ধি কৌশলে মানবমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, আত্মাবলম্বনই তাহাদিগের প্রধান সহায়। আত্ম-নির্ভর-শক্তি থাকিলে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রচিত্ততা ও কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া আইসে। যাহারা সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী, ঐ সকল সদ্গুণ তাহাদিগের নিকট স্থান লাভে সমর্থ নহে। "যে ব্যক্তি আপনার সহায় আপনিই হয়, ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকেন।" বস্তুতঃ, এই চিরন্তন মহাবাক্যটীর ভূরি ভূরি

প্রমাণ পৃথিবীর সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তাহারা অন্যদীয় সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া আপনার উপর যত নির্ভর করিয়া চলিবে, ততই তাহারা মহোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে পারিবে। যখন তিনি ইতর প্রাণীদিগকেও স্বাধীন হইয়া চলিবার শক্তি দিয়াছেন, তখন যে তিনি মনুষ্যদিগকে স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত রাখিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আত্মার যথেচ্ছ বিনিযোজন, বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেচ্ছ বিষয় পরিচিন্তনে মানবমাত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব আত্ম-নির্ভর-শক্তি যে মনুষ্যমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ গুণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সমাজ মনুষ্য লইয়াই সংগঠিত। সমাজ সমুন্নত করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের সমুন্নতির সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ ব্যক্তিগত উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়াই সমষ্টিগত উৎকর্ষাপকর্ষের গণনা হইয়া থাকে। দেশীয় স্বাধীনতা ও উন্নতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উন্নতির সংকলনমাত্র। কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হইলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতাপ্রিয়, শ্রমী, উৎসাহশীল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দোষোৎপাটন করিয়া গুণরোপণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অলস ও নিরুৎসাহকে শ্রমশীল ও সমুৎসাহী করা, অমিতাচারীকে মিতাচারী করা, এবং পানাসক্তকে পান-দোষ-বর্জ্জিত করা রাজা ও রাজাজ্ঞার ক্ষমতাতীত। নষ্ট-চরিত্রের দণ্ডবিধান দণ্ডনীতির অন্তর্গত, কিন্তু তাহার চরিত্র-সংশোধন দণ্ডনীতির আয়ত্ত্যধীন নহে। অতএব জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে তজ্জাতীয়

ব্যক্তিগত উন্নতির সবিশেষ আবশ্যকতা। স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতা ব্যক্তিগত না হইলে কখনও কোন জাতি স্বাধীন ও সমুন্নত হইতে পারে না। প্রত্যেক বর্ণ উত্তমরূপে পরিচিত হইলে যেরূপ সমস্ত বর্ণমালা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়, প্রত্যেক বৃক্ষের পাটী করিয়া দিলে যেরূপ সমস্ত বৃক্ষ-বাটিকার সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি হইলে তত্তৎব্যক্তির সমষ্টিগত সমস্ত জাতিরই উন্নতি সাধন হইয়া থাকে।

যদিও পর-সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া চলা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, তথাপি সময়বিশেষে ও অবস্থাভেদে অন্যকৃত সাহায্যের অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, আমরা যে সংসারে বাস করি, তাহাতে সম্পূর্ণরূপ সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া চলিলে অশেষ অসুবিধা ও কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকালে কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বিবেকশক্তি পরিপুষ্ট থাকে না; সুতরাং তৎ-কালে পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অধীন থাকা আমা-দিগের একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে জনক জননীগণ অশক্ত হইয়া পড়েন; অতএব এরূপ সময়ে তাঁহাদিগকে পুত্র কন্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শৈশবাবধি সকলের এরূপ অভ্যাস করা উচিত যে অধিকাংশ বিষয়েই অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতে না হয়। বালক-দিগের স্বয়ং বস্ত্র-পরিধান, মুখ-প্রক্ষালন ও স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা সবিশেষ কর্ত্তব্য। সন্তানেরা যাহাতে জনকজননী ও দাসদাসীগণের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকে, তদ্বিষয়ে পিতামাতা-গণের দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব যাহাতে অন্ন, বস্ত্র ও আবশ্যক সামগ্রীর জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়,

তদ্বিষয়ে বাল্যকাল হইতে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে পরাধীন ও পরপ্রত্যাশী হইতে হইবে না। আত্ম-নির্ভরই অভীষ্ট সিদ্ধির, সুখ বৃদ্ধির ও উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায়।

অধ্যবসায়।

অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে অবিচলিত মনোযোগ ও অবিরাম চেষ্টার নাম অধ্যবসায়। এ সংসার নিরন্তর বিঘ্ন-সঙ্কুল ও বিপদ্-পরিপূর্ণ। কিন্তু যিনি প্রশান্তচিত্তে বিপুল বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অনুষ্ঠিত বিষয়ে পূর্ণমনোরথ হন, তিনিই যথার্থ মহাপুরুষ। অধ্যবসায়-সম্পন্ন ব্যক্তি আরব্ধ কার্য্য সাধনে একবার বিফল-প্রযত্ন হইলেও নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া প্রড়েন না। যতদিন অভীষ্ট-সিদ্ধি না হয়, ততদিন তাঁহার মন কিছুতেই সুস্থির হয় না, এবং তাঁহার চেষ্টারও কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হয় না। অভীষ্টসাধনই তাঁহার প্রধান ব্রত এবং অধ্য-বসায়ই তাঁহার মূলমন্ত্র। যিনি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন-বিহত হইলেও তৎসমাধানে নিরতিশয় যত্নবান্ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন, অজ্ঞলোকে তাঁহাকে অপদার্থ ও ক্ষিপ্তমতি মনে করিয়া অশ্রদ্ধা করে। যাহাদের চিত্ত অতি দুর্ব্বল, তাহা-রাই গন্তব্য স্থান দুর্গম মনে করিয়া দূর হইতে পলায়ন করে; কিন্তু প্রকৃত অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি উহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকেন। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" অধ্যবসায়ের মূল সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া না চলিলে

কাহারও সমুন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা হীনাবস্থা হইতে আপনাদিগকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, অবিচলিত অধ্যবসায়ই তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। বায়ু-বিক্ষোভিত উত্তাল-তরঙ্গময় বারিধি-বক্ষে সুদক্ষ নাবিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি যেরূপ অর্ণবপোত রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া পুনঃ পুনঃ বিঘ্নবিহত হইলেও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ সেরূপ লক্ষ্যসাধন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যাহা নিরন্তর আমাদিগের প্রতিকূল, তাহাও অধ্যবসায় প্রভাবে অনুকূল হইয়া দাঁড়ায়। অনন্ত অধ্যবসায় থাকিলে দরিদ্র ধনী, মূর্খ পণ্ডিত এবং দুঃখীও সুখী হইয়া থাকে।

শারীরিক বল বলবত্তার প্রকৃত চিহ্ন নহে; মনস্বিতাই ইহার প্রধান পরিচায়ক। উদ্যমশীলতার তারতম্য অনুসারে পুরুষত্বেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিঘ্নভয়ে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে নীচ ও কাপুরুষ; যে ব্যক্তি বিঘ্ন-বিহত হইয়া আরব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হয়, সে মধ্যম ও নিন্দনীয় পুরুষ; কিন্তু যিনি বিপুল বিঘ্নবিপত্তি পাইয়াও ফলোদয় পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কার্য্যে প্রলিপ্ত থাকিতে পারেন, তিনিই উত্তম ও মহাপুরুষ। "প্রতিভা না থাকিলে কোন কার্য্যই সমাহিত হয় না", ইহা অলস ও কাপুরুষের কথা। অধ্যবসায়ই প্রতিভার আবরণ খুলিয়া দেয়। চিরমলিন মণি শাণাশ্মঘর্ষণে যেরূপ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, জড়বুদ্ধিও অধ্যবসায় গুণে সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে। বাল্যকালে অধ্যবসায় অঙ্কুরিত হইলে, যৌবনে তাহা পুষ্পিত ও বার্দ্ধক্যে তাহা অবশ্য ফলিত হইবে।

বিদ্যা, সদ্গুণ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে হইলে অধ্যবসায় গুণের সবিশেষ আবশ্যকতা। অধ্যবসায় শিক্ষা করিতে হয়। ধীরতা, একাগ্রচিত্ততা ও শ্রমশীলতা না থাকিলে প্রকৃত অধ্যবসায় শিক্ষা হয় না। বাল্যকাল অধ্যবসায় শিক্ষার প্রকৃত সময়। অধ্যবসায়ের অভাবে অনেক বালক পাঠের প্রারম্ভেই কোন বিষয় দুর্ব্বোধ দেখিলে, তাহাতে হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। ভয় ও আলস্য অধ্যবসায়ের প্রধান বিরোধী। অতএব যাহাতে ভয় ও আলস্য না আসিয়া সাহস ও শ্রমশীলতা আইসে, তদ্বিষয়ে বালকগণের সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। অধ্যবসায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে পরিশ্রমে অক্লিষ্টতা বোধ হয় ও অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি উত্তরোত্তর বলবতী হইতে থাকে। অস্ফুটবাক্ ডিমস্থিনিস্ বক্তৃতাকালে সভাস্থলে অপ্রতিভ হইয়া স্বীয় অনন্ত অধ্যবসায় বলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। স্কট্ল্যাণ্ডরাজ রবার্ট ব্রুস শত্রু-কর্ত্তৃক দ্বাদশবার পরাজিত হইয়া অবশেষে একটী ঊর্ণনাভের অধ্যবসায় অনুকরণ করিয়া ত্রয়োদশ বারে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ছিলেন। বীরকেশরী রণজিৎ সিংহ নিরক্ষর হইলেও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে সমস্ত পঞ্জাবে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। হীনাবস্থ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দরিদ্র কৃষ্ণদাস পাল অর্থাভাবে বেতন দানে অসমর্থ হইয়া বাল্যকালেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্জ্জয় অধ্যবসায় বলে ইংরাজী ভাষায় সুলেখক ও সুপণ্ডিত এবং রাজনৈতিক বিষয়ে সবিশেষ দক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া গিয়াছেন।

স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন জীবন জীবনই নহে—বিড়ম্বনামাত্র। উষর-প্রক্ষিপ্ত-বীজাঙ্কুর সমুদ্গমের ন্যায় চির-ব্যাধি-গ্রস্ত নষ্ট-স্বাস্থ্য লোকের নিকট কোন রূপ সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। বিদ্যালোক-প্রদীপ্ত গুণ-গ্রাম-ভূষিত অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ব্যাধি-মন্দিরে থাকিয়া রাজত্ব করা অপেক্ষা অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, চিরমূর্খ ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া সুস্থ শরীরে থাকিয়া কথঞ্চিৎ দিনপাত করাও বরং সহস্রগুণে শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয়। সময়ে সময়ে ব্যাধি-নিষ্পীড়িত ও উত্থান-শক্তি-রহিত দেহভার বহনাপেক্ষা মৃত্যুও অধিকতর আলিঙ্গ্য বলিয়া বোধ হয়।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন, "প্রথমতঃ শরীর-রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম-সাধন"। তাঁহাদের মতে শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত। অতএব এই নশ্বর দেহ যাহাতে আমরণ-কাল সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সকলের ধাতু ও প্রকৃতি সমান নহে ; এক জনের পক্ষে যে নিয়ম পথ্য ও হিতকর বলিয়া বোধ হয়, অন্যের পক্ষে তাহা অসহ্য ও অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। এজন্য স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না ; আপনাকেই বুঝিয়া লইয়া চালাইতে হয়। যেরূপ নিয়মে থাকিলে তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, অমনি তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আপাততঃ অনিষ্টকর হইতেছে না বলিয়া কদাপি তাহা পথ্য ও হিতকর মনে করিও না। যৌবনাবস্থায়

রক্ত ও ইন্দ্রিয় সকল সতেজ থাকে; তখন অবৈধাচরণ করিলেও সহসা অনিষ্ট-সংঘটন না হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় রক্তের তেজ ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রাবল্য কমিয়া আসিলে পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের ফল স্বরূপ নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। আহার বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। এ সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কদাপি তাহা একবারে করিও না; একান্ত আবশ্যক হইলে অন্যান্য বিষয়েও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে।

আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম ও বস্ত্রাদির দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের মধ্যে যাহাতে যে নিয়ম অবলম্বন করিলে তোমার সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তুমি গ্রহণ করিবে। প্রত্যুত, যাহা অসুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়, অমনি ক্রমে ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু যদি পরিবর্ত্তন-জনিত তোমার কোন রূপ অসুখ বোধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব নিয়মের অনুসরণ করাই বিধেয়। কারণ, তোমার ধাতু ও প্রকৃতি তুমি যেরূপ বুঝিবে, অন্যে সেরূপ বুঝিতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম ও ভ্রমণের সময় প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত থাকা দীর্ঘজীবন লাভ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকট-ভয়, অপচিকীর্ষা, অতি হর্ষ, অতি বিষাদ, গোপায়িত মনোব্যথা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কখন একবারে হতাশ হইও না; কারণ, আশাই দুঃখীর সুখ, তাপিতের শান্তি, দুর্ব্বলের বল ও ধরার অমৃত। একরূপ আমোদে নিরন্তর প্রলিপ্ত থাকিও না। যে সকল ইতিবৃত্ত ও উপন্যাস পাঠ করিলে মন প্রফুল্ল হয়, এবং যে সকল প্রাকৃতিক বিষয়

পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত ও উচ্ছ্বসিত হয়, সর্ব্বদা তাহাতে অবহিত থাকিবে। একবারে ঔষধ পরিত্যাগ করা ভাল নয়; কারণ আবশ্যক হইলে তাহা আর ফলপ্রদ হইবে না। প্রত্যুত, নিরন্তর ঔষধ-সেবন অভ্যাস করাও যুক্তি-সিদ্ধ নহে; কারণ পীড়াকালে তাহাতে আর কিছুমাত্র ফল দর্শিবে না। অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা ঋতুবিশেষে খাদ্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তন করা বিধেয়। এরূপ করিলে শরীরও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, অথচ ঔষধ-সেবন-জনিত কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

শরীরে অকস্মাৎ কোন অবস্থান্তর দেখিলে অমনি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিবে। পীড়াকালে কেবলমাত্র আরোগ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তৎকালে আপাত-মধুর পরিণাম-কটু সামগ্রী সুখসেব্য হইলেও কদাপি তাহা পথ্য ও হিতকর মনে করিও না। সুস্থাবস্থায় শ্রম-বিমুখ হওয়া উচিত নহে। শরীর কষ্টসহ হইলে কোন রোগই সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না। পর্য্যাপ্ত ভোজন করিবে, কিন্তু উপবাসেও কাতর হইও না। সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবে, কিন্তু রাত্রি জাগরণেরও অভ্যাস রাখিবে। সর্ব্বদা শ্রমশীল হইবে, কিন্তু বিশ্রাম করিতেও অবহেলা করিও না। এইরূপ উভয়বিধ আচরণই আয়ুষ্য ও স্বাস্থ্যকর। কোন কোন চিকিৎসক প্রকৃত রোগজয়ের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল রোগীর ইচ্ছানুসারেই ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা রোগীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল নিজ শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির অনুবর্ত্তী

হইয়া চলেন। এই উভয়বিধ চিকিৎসকই অবিবেচক ও অকর্ম্মণ্য। এরূপ স্থলে একজন মধ্যবিধ চিকিৎসকের অধীন থাকাই যুক্তি-সঙ্গত। যদি দ্বিবিধ-গুণ-শালী লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে দুই জনকেই মনোনীত করিবে। যিনি তোমার ধাতু সবিশেষ বুঝিয়াছেন ও যিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় অতি বিচক্ষণ, তিনিই তোমার প্রকৃত চিকিৎসক।

শৈশব।

শৈশব অতি সুখকর ও রমণীয়। তৎকালে হৃদয় অতি কোমল ও সরল এবং চিত্ত অতি প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। সংসারের যাবতীয় বস্তু আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়। তখন যৌবন-সুলভ দুর্জ্জয় ষড়রিপুর তাদৃশ প্রাবল্য থাকে না, এবং বার্দ্ধক্য-সুলভ দুর্ব্বিষহ পূর্ব্ব-স্মৃতি নিবন্ধন মনোব্যথা কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। শিশুর চক্ষু ও প্রস্ফুটিত পুষ্প উভয়ই তুল্য; কারণ, উভয়ই নিষ্কলঙ্ক, মনোরম ও পবিত্রতা-ব্যঞ্জক। শিশুর প্রীতি-প্রফুল্ল মনোহর মুখমণ্ডল তাহার নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হৃদয়ের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। তাহার মৃদু-মন্দ অস্ফুট ধ্বনি কর্ণ-কুহরে অমৃত বর্ষণ করে। তৎকালে দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য, প্রতারণা, দুরাশা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ও ভীষণ প্রবৃত্তি সকল তাহার হৃদয় ও চিত্ত অধিকার করিতে পারে না। যৌবনে যাহা করিতে লজ্জা, ভয়, ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, শৈশবে তাহা অবাধে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রোদনই শিশুর প্রধান বল, ও হাস্যই তাহার প্রধান সহচর।

শৈশব কাল,হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্ঞান-বীজ-বপনের প্রকৃত ঋতুস্বরূপ ; সেই সময়ে ইহাতে যেরূপ বীজবপন করিবে,আজীবন তাহারই ফল-ভোগ করিবে। অতএব শৈশবে হৃদয়ক্ষেত্র অকৃষ্ট ও পতিত রাখা বা ইহাতে কোন মন্দবীজ পড়িতে দেওয়া উভয়ই সমান সাংঘাতিক। কুরীতি, কুনীতি, কুসংস্কার প্রভৃতি কণ্টকী বৃক্ষ গুলি একবার বদ্ধমূল হইলে তাহারা সহজে উৎপাটিত হইবার নহে। যদি যত্ন করিয়া শৈশবে জ্ঞানবীজ বপন করিতে পার, তবেই তাহা যৌবনে বৃক্ষরূপে পরিপুষ্ট হইয়া বার্দ্ধক্যে তোমায় সুফল প্রদান করিবে। সরস ও কোমল বস্তুতে দ্রব্যান্তরের চিহ্ন যেরূপ দৃঢ়তররূপে সংলগ্ন হয়, নীরস ও কঠিন পদার্থে কখনই সেরূপ নহে। শৈশবে আমাদিগের অন্তঃকরণ মধূথবৎ কোমল থাকে। তৎকালে দয়া, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতাদি গুণগ্রামের অনুশীলন করিলে অন্তঃকরণে যেমন ঐ সকল গুণের দৃঢ় সংস্কার জন্মে, যৌবন বা বার্দ্ধক্যে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বাল্যকাল বিদ্যাশিক্ষার ও জ্ঞানোপার্জ্জনের উপযুক্ত সময়। এসময় বালকগণ যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা করা পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সবিশেষ কর্ত্তব্য। বালকগণ স্বভাবতঃ তরল-মতি। যাহাতে তাহারা কোনরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত না হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা বিধেয়। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি শিক্ষা দেওয়া আরও প্রয়োজনীয়। যাহাতে নীতিবাক্য গুলি তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া সমধিক আবশ্যক। অনেকে শিশু দিগের সমক্ষে কৌতুকচ্ছলে মিথ্যা কথা ও পরিহাসচ্ছলে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করা অতি অন্যায় ; কারণ ক্রমে ক্রমে ইহা তাহাদিগের

চিরাভ্যস্ত হইয়া আসিতে পারে। কুসংসর্গ বাল্যকালের একটী মহাদোষ। সঙ্গদোষে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রও কলঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব বালকগণ যাহাতে কুসংসর্গ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যৌবন।

যৌবন বিষম কাল। যৌবনের প্রারম্ভে ষড়্‌রিপুর প্রাবল্য ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তখন শত শত বিষয়ে কামনা, সামান্য কারণে ক্রোধ, পরকীয় দ্রব্যে লোভ, অপ্রিয় সংঘটনে মোহ, বিষয় বিশেষে মদ ও পরমঙ্গলে মাৎসর্য্য আসিয়া সমুপস্থিত হয়। চক্ষু,জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও কর্ণ এই জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণে সমধিক বলবান্ হইয়া উঠে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যেরূপ পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মানসিক শক্তিও সেইরূপ তেজস্বিনী এবং ভোগ-লালসা-বৃত্তিও সমধিক বলবতী হইতে থাকে। শৈশবে মন যেরূপ নির্বাত জলাশয়ের ন্যায় সুস্থির থাকে যৌবনে সেরূপ বায়ু-বিক্ষোভিত বারিধির ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। শৈশবে অন্তঃকরণ নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ও নিত্য-সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু যৌবন উপস্থিত হইলে দুশ্চিন্তা,দুরাকাঙ্ক্ষা ও অসন্তোষ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। তখন যাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যাইত, এখন তাহা উচ্চারণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতে হয়। তখন যাহা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতে হইত না, এখন তাহা করিতে লজ্জা, ভয় ও আত্মগ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই নিখিল পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার একটী সুবিস্তৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্র। ইহাতে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি তদনুরূপ ফলভোগী হইবেন। যুবকগণ যখন অনুরাগ ভরে সংসারে প্রথম প্রবেশ করে, তখন চতুঃপার্শ্বস্থ যাবতীয় বস্তু মনোরম বলিয়া বোধ হয়। চপলচিত্ততা যৌবনের প্রধান সহচর; এবং সংসারও নানাবিধ প্রলোভনে পরিপূর্ণ। যাহা আপাত-মধুর অথচ পরিণাম-কটু, তাহাই তাহারা সুখসেব্য ও হিতকর বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া কোন বিষয়েরই প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমুৎসুক নহে। তখন প্রমাদ, অবিবেক ও অবিমৃষ্যকারিতা আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এরূপ অপরিণত অবস্থায় অলস, অনবহিত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া চলিলে তাহাদিগের পদে পদে বিপদ্ ও ধ্রুববিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংসার-কাননে প্রবেশ কালে দুইটী পথ যুবকগণের নয়ন-গোচর হয়; একটী সৎ-পথ ও অন্যটী অসৎ-পথ। সৎ-পথ সম্মুখভাগে সঙ্কীর্ণ, বক্র ও দুর্গম; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ, সরল ও সুগম। অসৎ-পথ পুরোভাগে প্রশস্ত ও দীপালোকে প্রদীপ্ত; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে সঙ্কীর্ণ ও প্রগাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অতএব অসৎ-পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎ-পথ অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সৎ-পথে প্রচুর সম্পদ্ ও অসীম সুখ, এবং অসৎ-পথে বহুল বিপদ্ ও অশেষ দুঃখ।

ঈশ্বর-চিন্তা যুবকগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিলে তদীয় নিয়ম-লঙ্ঘনের তত সম্ভাবনা থাকে না। ঐশী ইচ্ছার বিরোধী ও সৃষ্টি-নিয়মের প্রতিকূল কার্য্য করিলে প্রত্যবায় জন্মে, এরূপ শুভ সংস্কার ক্রমে ক্রমে

বদ্ধমূল হইয়া যায়। অহমিকা-বৃত্তি যৌবনকালের নিত্য সহ-চরী। তরুণেরা সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অভ্রান্ত ও সুবিবেচক মনে করিয়া বৃদ্ধদিগের সারগর্ভ কথা অসার মনে করে। এজন্য অনেক সময়ে তাহাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়। যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উদ্দীপ্ত হইতে থাকে। যে কামনা ধর্ম্ম-বিগর্হিত ও লোকাচার-বিরুদ্ধ, কদাপি তাহাকে মনে স্থান দিবে না। ক্রোধ মনুষ্যের মহাশত্রু; কিন্তু স্থলও সময় বিশেষে প্রযুক্ত হইলে ইহা প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাকে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দূরীকরণ করা আবশ্যক। যাহারা কোন কারণ বশতঃ ক্রোধ প্রকাশ করে, তাহারা সেই কারণের অপগমেই প্রশান্ত হয়; কিন্তু যাহারা অকারণে কুপিত হয়, তাহাদিগকে কিছুতেই পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন করিতে পারা যায় না। সকল বিষয়েই অমায়িক, সত্যনিষ্ঠ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওয়া যুবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট প্রগল্‌ভ ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বিনয়নম্র হইয়া থাকাও তাহাদিগের সমধিক আবশ্যক। যৌবনে অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অনন্ত অধ্যবসায় অভ্যস্ত হইয়া আসিলে সুমহান্ কার্য্যও অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব প্রত্যেক কার্য্যের অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া ও চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে যুবকগণের স্খলিতপদ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

বার্দ্ধক্য।

বার্দ্ধক্য মানবজীবনের অপরাহ্ণ-স্বরূপ। সমস্তদিন কিরণ জাল বিস্তার করিয়া সূর্য্যদেব যেরূপ ক্ষীণকান্তি ও নিস্তেজ হইয়া পড়েন, শৈশব ও যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে আসিয়া আমরাও সেইরূপ অবসন্ন ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ি। এসময় যৌবন-সুলভ চিত্ত-চাপল্য ও অহমিকা-বৃত্তি অন্তর্হিত হয়; সুষুপ্তি-জনিত রজনীর বিশ্রামসুখ হীয়মান হইতে থাকে; এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রম, দুর্জ্জয় অধ্যবসায়, প্রগাঢ় মনোনিবেশ ও বলবতী বিচারশক্তি বিচ্যুত হইয়া পড়ে। ষড় রিপুর প্রাবল্য ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্য ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আইসে। স্মৃতি-শক্তির ক্ষীণতা, চিন্তা-শক্তির ন্যূনতা, উৎসাহ-শক্তির অল্পতা ও ভোগবাসনার হ্রস্বতা উত্তরোত্তর পরিলক্ষিত হইতে থাকে। দেহ ক্ষীণ, কান্তি অপগত, চর্ম্ম বলিত, চক্ষু নিমগ্ন, মুখমণ্ডল নিষ্প্রভ, তুণ্ড দন্তহীন, কেশপাশ কাশকুসুমবৎ, চরণযুগল চলৎ-শক্তি-বিরহিত, এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বহ-ভার-গ্রস্ত বলিয়া অনুভূত হয়।

সংসারের মোহিনী মায়ায় সকলেই সমাচ্ছন্ন। মায়াপাশ কাটিয়া নির্ম্মুক্ত হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। জরাজীর্ণ ব্যক্তির অন্তিম কাল উপস্থিত; তথাপি সংসারের জন্য সে সদাই ব্যস্ত। যৌবন-মদে মত্ত ও মোহান্ধ হইয়া কত শত মহাপাপ করিয়াছি, কত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি ও কত শত লোকের বিনা-দোষে মনস্তাপ দিয়াছি, ইত্যাদি দুর্ব্বিষহ পূর্ব্ব-স্মৃতি আসিয়া অনুক্ষণ তাহার সমধিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। সৃষ্টির কি অদ্ভুত কৌশল ও সংসারের কি বিচিত্র লীলা! মৃত্যুকাল দিন দিন

নিকটবর্ত্তী হইতেছে, শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি বিষয়-বাসনা পূর্ব্ববৎ বলবতী রহিয়াছে। কিসে আরও দিন কয়েক জীবিত থাকিতে পারি, কিসে পুত্র কন্যাদির ভরণপোষণের জন্য আরও কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারি, কিসেই বা তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, ইত্যাদিরই অনুধ্যান অনুক্ষণ তাহার চিত্তরাজ্য অধিকার করিয়া থাকে। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় তাহার বুদ্ধিশক্তি ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল ও ক্ষণে ক্ষণে নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা যেরূপ পরিশ্রান্ত ও পথিভ্রষ্ট পথিকের পথ প্রদর্শন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ সুখ ও আশা প্রাচীনের অন্তঃকরণে সমুদ্ভূত হইয়া পরক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

যৌবন শৈশবের পূর্ণবিকাশ ও বার্দ্ধক্য তাহার পরিণতি। যৌবনে যাহা পরিপুষ্ট ও বলবান্, বার্দ্ধক্যে তাহা পরিক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যুবকেরা সচেষ্ট, শ্রমশীল ও উৎসাহ-সম্পন্ন; বৃদ্ধেরা নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ ও শ্রমকাতর। কল্পনা ও উৎসাহ শক্তি যুবকগণের, এবং বিবেচনা ও মন্ত্রণাশক্তি বৃদ্ধগণের সর্ব্ব-প্রধান সহায়। নবীনেরা ক্ষিপ্রকর্ম্মা, নিঃসন্দিগ্ধ ও প্রাচীন রীতির বহির্ভূত; প্রাচীনেরা দীর্ঘসূত্রী, সন্দিহান ও চিরন্তন প্রথার পক্ষপাতী। নব্যেরা সকল কার্য্যেই স্পর্দ্ধাবান্ ও বদ্ধ-পরি-কর। তাহারা যুগপৎ নানা কার্য্য আরম্ভ করে বলিয়াই পরি-শেষে কোনটীই সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না। তাহারা কোন বিষয়ে ক্রমাবলম্বন করিতে বা বিলম্ব সহিতে অসমর্থ। আত্মমত অভ্রান্ত

বিবেচনা করিয়া তাহার প্রচারার্থ তাহারা সমুৎসুক হয় ; এবং সামান্য বিষয়ের জন্য বহু আড়ম্বর করিয়া তুলে। নখাগ্রে যাহা ছিন্ন হয়, তথায় তাহারা কুঠার প্রয়োগ করে ; এবং সূচ্যগ্রে যাহা সুসম্পন্ন হয়, তথায় তাহারা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। প্রাচীনেরা সকল কার্য্যেই আপত্তি প্রকাশ ও পরামর্শে বর্ষ ক্ষয় করেন ; এবং সামান্য বিঘ্ন বিপত্তি দেখিলেই ভগ্নোৎসাহ ও ভগ্ন-প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়েন। তাঁহারা স্বল্পলাভেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি নব্য ও প্রাচীন এই উভয়-বিধ লোকের একত্র সমাগম হয়, তাহা হইলে সংসর্গ-বশতঃ উভয়ের দোষ পরাস্পর সংশোধিত হইয়া সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যুবকেরা প্রবীন-দিগের রীতি, নীতি ও আচার ব্যবহার দেখিয়া আপনাদিগের দোষ গুণ বিচার করিতে শিখে। এরূপ করিলে উত্তর কালে তাহারা সকল বিষয়েই পারদর্শী হইতে পারিবে।

শৈশব যথানিয়মে অতিবাহিত না হইলে যৌবনও ভাস্বর হয় না, বার্দ্ধক্যও অশেষ সুখের আলয় হইয়া উঠে না। বর্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বসন্তে মুকুলোদ্গম না হইলে নিদাঘে সহকার তরু ফলপ্রসূ হইতে পারে না। ঈশ্বর-চিন্তা, শাস্ত্রালাপ ও আত্মীয় বন্ধুর সহিত সহবাস বৃদ্ধকালের সর্ব্বপ্রধান সহায। ঈশ্বর-চিন্তায় হৃদয় নির্ম্মল ও চিত্ত পবিত্র হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারা যায়। পরমাত্মায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া জীবনের শেষভাগ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!

শাস্ত্রালাপে বৃদ্ধকাল দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয় না। সে

সময়ে অন্যপ্রকার আমোদ প্রমোদের ইচ্ছা বলবতী থাকে না। সুতরাং শাস্ত্রালাপে অনুরক্ত থাকিলে দুঃখও সহসা অভিভূত করিতে পারে না। নিরুপায় বৃদ্ধকালে আত্মীয় বন্ধুর সহিত সহবাসও বড় সুখকর। তৎকালে তাহারা স্বয়ং পরিশ্রম করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ স্থলে স্বজনবর্গ নিকটে থাকিলে সমধিক সুখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিরুপায় বৃদ্ধ দশা সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিবার জন্য শৈশব ও যৌবন হইতে যথোচিত উদ্যোগ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কৃপণতা।

কৃপণের জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র। যে ব্যক্তি সবল হইলেও দুর্ব্বল, সুস্থ হইলেও অসুস্থ, ধনী হইলেও নির্ধন, নির্ভয় হইলেও নিত্য-শঙ্কিত, এবং সাহসী হইলেও কাপুরুষ, তাহার ন্যায় হীনচেতা ও হতভাগ্য লোক জগতে আর কে আছে! কৃপণ চিরকালই দরিদ্র। অভাব-গ্রস্ত দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচন হয়, কিন্তু অভাব-গ্রস্ত কৃপণের কিছুতেই অভাব মোচন হয় না। অন্নাহারে ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, এবং জলপানেও পিপাসুর পিপাসা-শান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়া ফেলিলেও দুরাকাঙ্খ কৃপণের কখনই উদরপূর্ত্তি হয় না। অর্থস্পৃহা যাহার বলবতী, তাহার আত্মা অতি দরিদ্র, এবং সৎকর্ম্ম তাহার নিকট স্থান লাভে সমর্থ নহে। অপরিমিত-অর্থ-লালসা হৃদয়-নিহিত হলাহল স্বরূপ। ইহা হৃদয়ের সমস্ত

উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকে কলুষিত ও বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। অনুচিত অর্থলালসা হৃদয়ে যেমন বদ্ধমূল হইয়া উঠে, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণ উহাকে দেখিবা মাত্র দূরে পলায়ন করে। ধন দান করিয়া দাতার মনে যেরূপ আত্ম-প্রসাদ জন্মে, ধন সঞ্চয় করিয়া কৃপণের মনে সেরূপ আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয়। অর্থ দাতার পরিচারক, কিন্তু উহা কৃপণের অধীশ্বর। দাতা অন্যের প্রতি সদয়, কৃপণ আপনার প্রতি নিষ্ঠুর। দাতার হৃদয় প্রশস্ত ও চিত্ত উন্নত, কৃপণের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও চিত্ত অবনত। আত্মোৎসর্জ্জন দাতার চরম লক্ষ্য, আত্ম-বঞ্চন কৃপণের পরিণাম ফল। দানে দাতার সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি জন্মে; রক্ষণে কৃপণের অসুখ, অশান্তি ও অতৃপ্তি উপস্থিত হয়। অর্থদানে রিক্তহস্ত হইলেও দাতা পুণ্যসঞ্চয় করেন; অর্থসংগ্রহে অনুরত থাকিলেও কৃপণের পাপসঞ্চয় হয়। মূর্খ-পুত্র পণ্ডিত-পিতার যেরূপ লজ্জাজনক, কৃপণ-পুত্রও দানশীল-পিতার সেইরূপ কুলাঙ্গার-স্বরূপ।

কৃপণের অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহার ন্যায় আত্ম-বঞ্চক জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ধন তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, এবং ধনোপার্জ্জন ও ধন-সঞ্চয়ই তাহার সর্ব্ব প্রধান ব্রত। গৃহ-সজ্জা ক্রয় করিবার নিমিত্ত নির্ব্বোধ লোকে যেরূপ গৃহ বিক্রয় করিয়া থাকে, কৃপণ ব্যক্তিও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইব, এই রূপ আশা করিয়া অর্থোপার্জ্জনার্থ অন্তঃকরণের সমস্ত শান্তি বিনিময় করিয়া থাকে। কৃপণ ব্যক্তি অর্থের পরিচর্য্যা করে, কিন্তু অর্থ তাহার পরিচর্য্যা করে না। অধিকৃত অর্থ তাহার পক্ষে অগ্নি স্বরূপ; কারণ উহা তাহাকে নিরন্তর দগ্ধ ও নিপীড়িত

করিতে থাকে। গর্দ্দভ যেরূপ তাহার নিপীড়িত পৃষ্ঠে পিণ্ডীভূত স্ুবর্ণরাশির ভার বহন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, নির্ব্বোধ কৃপণও ধনভার মাত্র বহন করিয়া সেইরূপ কথঞ্চিৎ দিন পাত করিতে থাকে, এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে সেই দুর্ব্বহ ভার হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়। কৃপণ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও অর্থনাশ ভয়ে সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। সন্তান বা স্বজনবর্গকে স্ুশিক্ষা দান, পীড়াকালে স্ুচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসাকরণ প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাহার অনিচ্ছা ও শৈথিল্য দেখা যায়। কদন্ন আহার করিতে, এমন কি নিরন্ন থাকিতে পারিলেও এরূপ লোক বোধ হয় কিছুমাত্র কাতর ও সঙ্কুচিত নহে। মহাসমুদ্র ও মহাকৃপণ উভয়ই সমান। সমুদ্র অপার ও অগাধ হইলেও তাহার জল বিস্বাদ ও অপেয়; কৃপণের ধন অসীম ও অপরিমেয় হইলেও তাহা নিরর্থক ও অব্যবহার্য্য। অসংখ্য নদ নদী গ্রাস করিয়া ফেলিলেও সমুদ্রের যেরূপ কখনই উদরপূর্ত্তি হয় না, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি হইলেও কৃপণের সেই রূপ কখনই তৃপ্তি-লাভ হয় না। কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু উত্থিত হইলে সমুদ্রের জল যেরূপ অস্থির ও উদ্বেল হইয়া উঠে, ধনলিপ্সার উদ্দীপন হইলে কৃপণের মনও সেইরূপ অশান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ধন-লোভীর লোভানল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার নহে; ঘৃতাহুতি পাইলে বরং তাহা অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া থাকে। কৃপণের নামোচ্চারণেও প্রত্যবায় আছে। যাহারা ক্ষমতা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত্তকে মুষ্টিমাত্র অন্নদান এবং পিপাসার্ত্তকেও বিন্দুমাত্র জল দান না করিয়া নিশীথ রাত্রিতে কুসীদ-গণনায় অভিনিবিষ্ট হয়; যাহারা

অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকারে ঝঞ্ঝাবাত-পীড়িত দ্বারস্থ ও শরণাপন্ন অতিথিকে দূরস্থ ও বিপন্ন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে, প্রাতঃকালে তাহাদের নামগ্রহণেও ভদ্রলোকে যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বথা যুক্তি-সঙ্গত। এরূপ অনুচিত অর্থলালসা-গ্রস্ত কৃপণের অন্তিম কাল বড় ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক। আসন্ন কালে লোকে সংসারের মোহিনী মায়ায় স্বভাবতঃ সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। নিরন্ন ও নির্ব্বস্ত্র থাকিয়া যাহা এত দিন সঞ্চয় করিয়া ছিলাম, তাহা এখন ফেলিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া কৃপণ দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার পূর্ব্বকৃত-আত্ম-বঞ্চনা-স্মৃতি আসিয়া নিরন্তর তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে থাকে।

অর্থগৃধ্নু লোকের অসাধ্য কিছুই নাই। অনুচিত অর্থলালসা থাকিলে লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, মার্সস্ ক্রোশস্ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। ইনি এক জন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র। রোম নগরে এক প্রকার উচ্চপদ ছিল; সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে কেহই এই পদ প্রাপ্ত হইতেন না। দেশীয় লোকের রীতি, নীতি, আয়, ব্যয় প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইত। মার্সসের পিতা নিজ গুণে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রোশস্ও ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া সিজার ও পম্পের সমকক্ষ হইয়া ছিলেন। তাঁহার অনেক গুলি সদ্গুণ ছিল; কিন্তু এক অসঙ্গত অর্থ-তৃষ্ণার প্রভাবে তাহারা মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। অতিথি-সৎকারে তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল। দ্বারস্থ শরণাপন্ন

অতিথিকে তিনি কখন দূরস্থ ও বিপন্ন করিতে পারিতেন না। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তি বড় বলবতী ছিল। বক্তৃতাবলে তিনি অনেক সময়ে স্বদেশের মহোপকার সাধন করিয়া ছিলেন। তাঁহার সময়ে রোম রাজ্য একপ্রকার অরাজক হইয়া উঠিয়া ছিল। নিরপরাধ ব্যক্তিরা অপরাধী বলিয়া দাণ্ডত হইলে, যুক্তি-গর্ভ বচন-পরিপাটি দ্বারা তিনি বিচারকের মনে তাহাদিগের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করাইয়া তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতেন। বিনয়-নম্রতা গুণও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি একজন অতি উচ্চপদস্থ লোক হইলেও সামান্য ব্যক্তির নমস্কার গ্রহণ করিয়া প্রতি-নমস্কারেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। ইতিহাস, দর্শন, ও বিজ্ঞানশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

কিন্তু এতাদৃশ সদ্গুণশালী হইলেও ধনের লোভে তিনি অশ্রদ্ধেয় কর্ম্মে লিপ্ত হইলেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি যে অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাকে একবার একটী উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিয়া পুনর্ব্বার তাহা খুলিয়া লইয়া ছিলেন। ক্যাটিলাইন্ যখন ষড়যন্ত্র করিয়া রোম নগরীর উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হয়, তখন ক্রোশস্‌ও অর্থাগমের প্রত্যাশায় তাহাতে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। রোমের বিপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে তাঁহারও সম্পদ্‌কাল উপস্থিত হইত। রোমে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া সল্লা যখন সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন, ক্রোশস্‌ও তখন সুবিধা পাইয়া স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন। রোমের গৃহ সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত ও অতি-সন্নিহিত ছিল। একবার অগ্নি লাগিলে বহুসংখ্যক গৃহ দগ্ধ হইয়া যাইত। অগ্নি লাগিলে গৃহস্থগণ

যখন সর্ব্বনাশ ভয়ে হাহাকার করিত, অর্থগৃধ্নু ক্রোশস্ও তখন মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন। তিনি গৃহ-স্বামী দিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া দহ্যমান ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গৃহ সকল ক্রয় করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক কর্ম্ম-কার, সূত্রধর ও ভাস্কর ভৃত্য ছিল। তিনি ঐ সকল গৃহের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া ভাড়া দিতেন। ক্রোশস্, পম্পি ও সিজারের সহিত যোগ দিয়া বলপূর্ব্বক দেশ বিভাগ করিয়া লইতেন। যখন তিনি পার্থিয়াবাসিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করেন, তখন আটিয়স্ তাঁহাকে তথায় যাইতে অনেক নিষেধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু ক্রোশস্ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অব-শেষে তিনি ক্রোশসের গতিরোধ করিবার জন্য রোমের বহির্দ্বারে ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিয়া স্বীয় ইষ্ট-দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। রোমে এরূপ সংস্কার ছিল যে, অভিশপ্ত হইলেই ভয় জন্মিবে, এবং ভয় জন্মিলেই সংকল্পিত বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। প্রত্যাবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, অবাধে গন্তব্য স্থানে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অবশেষে শত্রু কর্ত্তৃক একটি বৃহৎ বালুকাময় প্রান্তরে নীত হইয়া সপুত্র ও সসৈন্য নিহত হইলেন। ক্রোশসের ধনলোভেই নিষ্কলঙ্ক রোম কলঙ্কিত হইয়া ছিল। "লোভেই পাপ ও পাপেই মৃত্যু" এই চিরন্তন প্রবাদটি যে সম্পূর্ণ সত্য ও সারবান্, ক্রোশসের জীবনই তাহার প্রধান সাক্ষ্য স্থল।

মিতব্যয়িতা।

সম্মান রক্ষা ও সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্যই সংসারে অর্থের প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন উপযোগিতা নাই। অনেকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ, কিন্তু তাহার উপযুক্ত ব্যয় করিতে অসমর্থ। উপার্জ্জনের সময় যেরূপ বুদ্ধি ও যত্নের আবশ্যকতা হয়, ব্যয়ের সময়েও সেইরূপ বিবেচনা ও পরিনাম-দর্শিতার প্রয়োজন হয়। অনাবশ্যক ও অনুচিত বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া আবশ্যক ও উচিত বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ। বিলাস-ক্ষেত্র ধনের শ্মশান-ভূমি; বিলাসিতায় ধনরাশি যেরূপ শীঘ্র ভস্মীভূত হইয়া যায়, অন্য কিছুতেই আর সেরূপ নহে। জগতের হিত-সাধনে মুক্তহস্তে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া রিক্তহস্ত হওয়াও দূষণীয় নহে; কিন্তু নিষ্ফল আমোদ প্রমোদে কপর্দ্দক-মাত্র ব্যয় করা অতীব গর্হিত। মিতব্যয়িতাই সম্পন্ন হইবার প্রধান উপায়। মিতব্যয়ী হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদায় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মিতব্যয়ী হইতে গিয়া ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া উচিত নহে। কৃপণতা ও অমিত-ব্যয়িতা উভয়ই ঘৃণাকর ও দোষাবহ। যে ব্যক্তি অনুচিত ব্যয় করিয়া সমস্ত ধন নিঃশেষিত করিয়া ফেলে, তাহার পুত্রপৌত্রাদিগণ যে কেবল পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হয় এরূপ নহে; তাহাকেও স্বয়ং শেষে কষ্ট পাইতে হয়। অমিতব্যয়ীর ন্যায় কৃপণের পুত্র-পৌত্রাদিগণ ক্লেশ পায় না বটে, কিন্তু সে স্বয়ং ভোগসুখে বঞ্চিত হয়।

অর্থ যেরূপ যত্নে অর্জ্জিত ও রক্ষিত হয়, তদপেক্ষা অধিকতর যত্নে তাহা ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক। সংসারে অনেক বিপদ আপদ আছে। পীড়াকালে বা বৃদ্ধাবস্থায় উপার্জ্জন করিবার

ক্ষমতা থাকে না। অতএব এরূপ অসময়ের জন্য উপার্জ্জিত অর্থের কিছু কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহার সমুদায়ই যদি ব্যয় করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে কষ্ট পাইতে হইবে। সর্ব্বদা ধনাগম ও ধনাপগমের সাম্য রক্ষা করিয়া চলা উচিত। অন্যায় ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া যাহাতে অর্জ্জিত অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চিত হয়,তাহা লোক মাত্রেরই আবশ্যক। নীতিশাস্ত্রকারেরা কহেন, সঞ্চয়ী ব্যক্তি অবসন্ন হয় না। যাহারা এই নীতিবাক্যে অবহেলা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সেই সঞ্চয় চেষ্টা যাহাতে ন্যায়সীমা অতিক্রম করিতে না পারে, তদ্বিষয়েও সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সঞ্চয়-চেষ্টা অনুচিত বলবতী হইলেই লোকে কৃপণ হইয়া পড়ে। মিতব্যয়ী হইবে, কিন্তু কৃপণ হইও না। কৃপণতা ও মিতব্যয়িতা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। কৃপণের সঞ্চয় অভ্যাসজাত, মিতব্যয়ীর সঞ্চয় ইচ্ছাকৃত। কৃপণের সঞ্চিত অর্থ তাহার দুঃখের কারণ, মিতব্যয়ীর সঞ্চিত অর্থ তাহার সুখের কারণ।

যাহার যেরূপ আয়, তাহার তদনুরূপ ব্যয় করা কর্ত্তব্য। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে পরিণামে নিঃস্ব হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। বাহিরে এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হয়। কেবল স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করা উচিত; কিন্তু যদি ধনবান্ হইবার বাসনা থাকে, তবে তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র।

প্রভূত ধনশালী হইলেও আপনার বিষয়-সম্পত্তি আপনি

পর্য্যবেক্ষণ করা ক্ষুদ্রতার চিহ্ন নহে। তবে স্বয়ং অক্ষম হইলে এক জন ধার্ম্মিক ও সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে তাহার ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা আয় ও ব্যয়ের সাম্য রক্ষা করা উচিত। এক বিষয়ে অধিক ব্যয়ের আবশ্যকতা হইলে অন্য বিষয়েও ব্যয়ের ন্যূনতা করিতে হইবে। যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভূত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি বাসগৃহের আড়ম্বর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অশ্ব, শকট ও যান-বাহনাদির ব্যয় কমান আবশ্যক। এরূপ না করিলে শীঘ্রই উৎসন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অনেকে ঋণ করিয়া ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ করা অতি অন্যায়। ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। যদি একবারে পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে একবারেই পরিশোধ করা কর্ত্তব্য; নতুবা ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ করিবে। ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিলে মিতব্যয়িতা অভ্যস্ত হইয়া আইসে। যাহাকে ঋণমুক্ত হইতে হইবে, তাহার অল্পব্যয়েও কুণ্ঠিত হওয়া নিন্দনীয় নহে। নিতান্ত অল্প হইলেও ব্যয় বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে নিজ ব্যয়ের তালিকা লইতে কখনও লজ্জাবোধ করিওনা, এবং নিজ-ব্যয় স্বীয় দৃষ্টির অধীন রাখাকেও হীনতা মনে করিও না। অল্প আয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়া ক্ষুদ্রের কর্ম্ম বটে, কিন্তু অল্প ব্যয়ে বিমুখ হওয়া তাদৃশ দূষণীয় নহে। নিত্যকর্ম্মে ব্যয় বাহুল্য করিতে হইলে নিজ আয় বিলক্ষণ বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু নৈমিত্তিক কার্য্যে বিবেচনা পূর্ব্বক উদার ও মুক্তহস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ না করিলে সম্ভ্রম রক্ষা হয় না।

জগতের অনেকানেক মহাপুরুষ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও মিতব্যয়ী ছিলেন। বীরকেশরী সিকন্দার ম্যাসিডনের অধীশ্বর হইলেও স্বীয় সামান্য সেনাপতি দিগের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। অগষ্টস্ নিখিল ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও বেশভূষার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখিতেন না। জর্ম্মনির সম্রাট রোডলফ্ ও ফ্রান্সের অধীশ্বর একাদশ লুই পরিচ্ছদ পরিপাটির জন্য অন্যায় ব্যয় করিতেন না।

নীতি-কথা ও দৃষ্টান্ত-মালা।

১। দুর্জ্জন ব্যক্তি সকলকেই দুর্জ্জন বলিয়া মনে করে। পাণ্ডুরোগীর চক্ষে সংসারের যাবতীয় বস্তু হরিদ্রাবর্ণ দেখায়।

২। অসজ্জন লোক সজ্জনের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে। ধূম নির্ম্মল আকাশকে মলিন করিয়া তুলে।

৩। সুচতুর ও কার্য্যাপেক্ষী লোক স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই প্রীতি প্রকাশ করে। লোভার্ত্ত শৌনিক লাভের প্রত্যাশায় পেশল শস্যে মেষের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

৪। লোকে স্বয়ং দোষ করিয়া অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। কূপ-খনিতা ও প্রাচীর-নির্ম্মাতার ন্যায় মানুষ নিজ কর্ম্ম ফলে অধঃ ও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়।

৫। সাধুর সহিত সাধুর মিলন হইলে তাহা অসাধুর পক্ষে অসহ্য। তৃণ, জল ও সন্তোষ মৃগ, মৎস্য ও সজ্জনের নিত্য অবলম্বন; কিন্তু লুব্ধক, ধীবর ও পিশুন ইহাদিগের চিরশত্রু।

৬। মহাত্মা ব্যক্তি নির্ধন হইলেও স্বীয় মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া থাকেন। সুবিশাল বৃক্ষ পত্র-পুষ্প-বিহীন হইলেও সে তাহার উন্নত ভাব পরিত্যাগ করে না।

৭। গুণবান্ ব্যক্তির নম্রতাই স্বভাব-সিদ্ধ গুণ। বৃক্ষ ফল ভরেই অবনত নয়; মেঘ পরিপূর্ণ হইলেই পৃথিবীতে অবতরণ করে।

৮। সাধু ব্যক্তি সাধু ব্যক্তিরই গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বায়ুর সাহায্যেই পুষ্পের সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়।

৯। যাঁহারা প্রকৃত সাধু, কুসংসর্গে পড়িলেও তাঁহাদের স্বভাব নষ্ট হয় না; এবং অপকার প্রাপ্ত হইলেও উপকার করিতে তাঁহারা অধিকতর যত্নবান্ হন। কাকের বাসায় প্রতিপালিত হইলেও কোকিল তাহার সুমিষ্ট স্বর পরিত্যাগ করে না; এবং অগ্নি-দগ্ধ হইলে কর্পূর আরও অধিক সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে।

১০। আহার করিতে পাইলে অনেকেই বন্ধুত্ব রাখিয়া থাকে। মুখলেপ পাইলে মৃদঙ্গ মধুর ধ্বনি করিয়া থাকে; ভৃঙ্গ হেমন্তে পদ্মিনীর দিকে কটাক্ষপাত করিতেও বিরক্তি প্রকাশ করে।

১১। সময়ে সময়ে বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইতে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। স্বল্প-সলিল কূপ অতল-স্পর্শ জলধি অপেক্ষা তৃষ্ণার্ত্তের অধিকতর আদরণীয়।

১২। যাহার নিজের বুদ্ধি নাই, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার কি ফল হইতে পারে? দর্পণ অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিতে পারে না।

১৩। স্থানচ্যুত হইলে প্রবলও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। জল-নিঃসৃত কুম্ভীর কিঞ্জুলুকবৎ ও বন-বিনির্গত সিংহ শৃগালবৎ প্রতীয়মান হয়।

১৪। যাহা স্বভাবসুন্দর তাহা আর সংস্কারের অপেক্ষা রাখে না। রূপীয়সীর বেশভূষা ও মুক্তারত্নের শাণাশ্ম-ঘর্ষণ বিড়ম্বনামাত্র।

১৫। সংসারে জীবমাত্রেই স্বার্থপর। নিকৃষ্ট পশু-পক্ষ্যাদি হইতে উৎকৃষ্ট মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই স্বার্থের জন্য প্রধাবিত। বৃক্ষ ফলশূন্য হইলে পক্ষী প্রস্থান করে; পুষ্প পর্য্যুষিত হইলে ভ্রমর উড়িয়া যায়; সরোবর শুষ্ক হইলে সারস সরিয়া যায়; বন বিদগ্ধ হইলে মৃগ পলাইয়া যায়; রাজা শ্রীভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রী ছাড়িয়া যায়; প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপা স্নেহময়ী জননীও স্নেহের অনুরোধে হৃদয়-সর্ব্বস্ব সন্তানকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে চাহেন না।

হিন্দুজাতির যোগবল ও হরিদাস যোগী।

হিন্দু জাতির যোগবলের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাহা কর্ণে শুনিলে অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, এবং চক্ষে দেখিলেও সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে পারে! আমরা হিন্দু, অন্ধকারে পড়িয়া আছি। আমাদিগের যোগবলের অলৌকিক ব্যাপার শুনিলে হিন্দু-ধর্ম্ম-দ্বেষী অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা পরিহাস করিয়া উঠিবে। হরিদাসের যোগবল এরূপ ছিল যে ইচ্ছা করিলেই তিনি অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সম্মুখে বা পশ্চাদ্ভাগে কেহ দাঁড়াইলে না দেখিয়া তাঁহার নাম বলিয়া দিতে পারিতেন। তিন চারি মাস অনশনে থাকিয়া মৃত্তিকার ভিতর

অবস্থান; একাসনে বসিয়া নিমেষ মধ্যে ত্রিভুবনের যাবতীয় কার্য্যকলাপ পরিদর্শন, জলরাশির উপর দিয়া যথেচ্ছ গমনাগমন ইত্যাদি তাঁহার অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনিলে কাহার মনে না বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়? অধিক দিন হয় নাই; আমরা ১৮৩৪।৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। তখন লর্ড-উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশের গভর্ণর জেনারল। সুতরাং ৫৫ বৎসর মাত্র অতীত হইল, হরিদাস নামক জনৈক যোগ-সিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এক দিন লাহোর, জম্বু ও যশল্মীর প্রভৃতি স্থানে শত শত মুসলমান ও অন্যূন ছয় শত ইউরোপীয় দিগকে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া স্তম্ভিত করিয়া ছিলেন। আজি মহারাজ রণ-জিৎ সিংহ জীবিত নাই; জীবিত থাকিলে তিনি নিজমুখে হরি-দাসের পরিচয় দিতেন। সে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ওয়েড সাহেবও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; থাকিলে তিনি প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারিতেন। যিনি সমাধিগত হরিদাসের নিস্পন্দ শরীর, নিশ্চল নাড়ী ও নিকম্প হৃৎপিণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ম্যাক্‌গ্রেগর সাহেবও এখন জীবিত নাই। ডাক্তার মরে, জেনা-রল ভেঞ্চুরা, ম্যাক্‌নাটন্ এবং বৈলো সাহেবেরও মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকিলে তাঁহারাও হরিদাসের অদ্ভুত ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারিতেন। তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রণীত গ্রন্থ সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থই হরিদাসের অদ্ভুত ক্ষমতার অন্যতর প্রমাণ।

বীর-কেশরী রণজিৎ সিংহের প্রধান মন্ত্রী রাজা ধ্যানসিংহ যখন জম্বুতে থাকিতেন, তখন তিনি প্রত্যহই একটী সাধুর

অলৌকিক ক্ষমতার গল্প শুনিতে পাইতেন। জয়স্রোত ও অমৃতসর হইতে যে সকল রাজদূত জম্বুতে আসিত, তাহারা সকলেই বলিত "এমন সিদ্ধপুরুষ কখনও দেখি নাই। জয়-স্রোতে তাঁহাকে তিন মাস মাটির ভিতর পুতিয়া রাখা হইয়াছিল; তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। অমৃতসরেও আবার তিনি এক মাস কাল প্রোথিত থাকিবেন।" এই সকল কথা শুনিয়া ধ্যানসিংহ কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। পারিষদবর্গ কহিল "সন্ন্যাসী আজিও মৃত্তিকায় প্রোথিত আছেন; ইচ্ছা করিলেই মহারাজ স্বচক্ষে দেখিয়া ইহার সন্দেহ অপনয়ন করিতে পারেন"। স্বয়ং দেখিতে না গিয়া তিনি অমৃতসরে দুই তিন জন লোক পাঠাইয়া দিয়া কহিয়া দিলেন যে সমস্ত ব্যাপার যদি সত্য হয়, তবে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি সহকারে সন্ন্যাসীকে জম্বুতে লইয়া আসিবে; আর যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কোন কথা না বলিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে। দূতেরা অমৃতসরে গিয়া দেখিল নগর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কেহ গল-লগ্ন-বস্ত্রে ভূমিতে লুটাইয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে, কেহ পুষ্প-চন্দন ছড়াইতেছে, কেহ ফল, মূল ও দুগ্ধ মৃত্তিকায় রাখিয়া উদ্দেশে নিবেদন করিতেছে। সন্ধ্যাকালে পুরনারীগণ ঘৃতের প্রদীপ হস্তে লইয়া সমাধি-বেদীর চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া দিতেছে। বন্ধ্যানারী পুত্রকামনায় বেদীর উপর লোষ্ট্র সাজাইয়া রাখিতেছে। অন্ধ, খঞ্জ ও চিরাতুরেরা সেই পুণ্যভূমির ধূলি গায়ে মাখিয়া আপনাদের অপবিত্র দেহ পবিত্র করিতেছে। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসীকে উত্তোলন করা হইল। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ, দেহ শীতল ও প্রাণ-শূন্য।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে কোথা হইতে সেই মৃত শরীরে প্রাণ-বায়ু আসিল, এবং যোগীও সচেতন হইয়া ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের লোকেরা জম্বুতে লইয়া যাই-বার জন্য অনেক অনুনয় করিলেন,কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হই-লেন না। এই সংবাদ জম্বুতে পঁহুছিলে ধ্যানসিংহ স্বয়ং অমৃতসরে আসিয়া সশিষ্য যোগীকে জম্বুতে লইয়া গেলেন। তথায় সন্ন্যাসী চারি মাস মৃত্তিকার ভিতর জড়বৎ পড়িয়া থাকেন, ধ্যানসিংহ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত দাড়ী গোঁপ কামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; এবং এই চারি মাসের মধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র চুল গজায় নাই।

ক্রমে ক্রমে হরিদাসের কথা ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা দেশের দুই এক জন সংবাদ-পত্র-লেখক সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক বিদ্রূপ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও তৎপরে লর্ড অক্ল্যাণ্ড এ বিষয়ে তথ্য লইবার জন্য পঞ্জাব ও রাজপুতনার এজেণ্ট দিগকে সর্ব্বদাই পত্রাদি লিখিতেন। হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়া-ছিল। যখন হরিদাস শিষ্যগণ লইয়া পুষ্করে ভ্রমণ করিতে গিয়া ছিলেন, তখন ম্যাক্‌নাটন সাহেব রাজপুতনায় এক জন রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ছিলেন। স্বয়ং লাট সাহেব হরিদাসকে দেখিবার জন্য ম্যাক্‌নাটনকে এক খানি পত্র লিখিয়া ছিলেন। এজন্য ম্যাক্‌নাটন সাহেব কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য হরিদাসকে অনেক অনুরোধ করিলেন। হরিদাস শুনিয়া ছিলেন, কলিকাতায় যাঁহারা হিন্দু আছেন,তাঁহারা বিধর্ম্মী দিগেরও উচ্ছিষ্ট

ভোজন করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, কলিকাতায় গেলে তথায় আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে। এই ভাবিয়া তিনি সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন অধিক অনুরোধ নিষ্ফল জানিয়া ম্যাক্‌নাটন্ সাহেব সন্ন্যাসীকে পুনরেই পরীক্ষা করা যাউক ঐরূপ স্থির করিলেন। সমস্ত আয়োজন করা হইল। এবার তাঁহাকে মৃত্তিকায় পোতা হয় নাই। সন্ন্যাসী সমাধিস্থ হইলে ম্যাক্‌নাটন্ সাহেব তাঁহাকে সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া আপনার ঘরে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলেন। তের দিন অতীত হইলে সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলেন, হরিদাসের শ্বাস প্রশ্বাস নাই। তাঁহার সমস্ত শরীর কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার অচেতন দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। তৎপরে ম্যাক্‌নাটন্ সাহেব এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা কলিকাতায় লাট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

যশল্মীরের মহারাওল নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রকামনায় তিনি বহুবিধ দৈবানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটীই সার্থক হইল না। তখন তিনি স্থির করিলেন তাঁহার অদৃষ্টে সন্তান নাই। তৎকালে রাজপুতনায় হরিদাসের মহা প্রাদুর্ভাব। তখন ঈশ্বরলাল নামক মহারাওলের জনৈক মন্ত্রী সন্তানের উদ্দেশে হরিদাসকে দিয়া দৈবানুষ্ঠান করিতে বলিলেন। হরিদাস আসিয়া মহারাওলকে শুচি হইয়া থাকিতে কহিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখ সমাধির দিন স্থির হইল। নগরের প্রান্তভাগে গৌরী সরোবরের পশ্চিম কূলে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী গৃহ ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮ হাত ও প্রস্থে ৬ হাত। হরিদাসের আদেশ ক্রমে গৃহের মেজের ভিতর একটী গর্ত্ত খনন

করা হইয়াছিল। তাহাতে রেশম,পশম ও মকমলের বস্ত্র বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। হরিদাস সমাধিস্থ হইয়া বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইলে পাছে কীটাদিতে তাঁহার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে, এই জন্যই বস্ত্রাদি দ্বারা গর্ত্ত আবৃত করা হইয়াছিল। সমাধিগর্ত্তের উপর দুইখানি বৃহদাকার প্রস্তর চাপাইয়া দিয়া গৃহদ্বারও প্রস্তর দিয়া উত্তমরূপে গাঁথাইয়া দেওয়া হইল। এই সময়ে লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ বৈলো সাহেব যশল্মীরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ট্রিভিলিয়ান সাহেবের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমাধি-মন্দির দেখিতে যাইতেন। দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। ১লা এপ্রেল তারিখে মধ্যাহ্ন কালে গৌরী সরোবরের তীর গুলি লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। রাজা পুত্র-লাভ করিবেন মনে করিয়া নগরের সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। ঈশ্বরলালের আজ্ঞা পাইয়া গর্ত্তের প্রস্তর খোলা হইলে দেখিতে পাওয়া গেল, হরিদাস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে উপরে তুলিয়া দুই জন শিষ্য কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার উদর শুকাইয়া গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে ও দাঁতকপাটী লাগিয়াছে। শিষ্যেরা দাঁতকপাটী ভাঙ্গিয়া বহুকষ্টে একটু জল উদরস্থ করাইল। বৈলো ও ট্রিভিলিয়ান সাহেব দ্রুতবেগে দেখিতে আসিলেন। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইল দেখিয়া তাঁহারা একবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাওল হরিদাসকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু সমাধির পর তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়া ছিলেন! হরিদাসও কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ও একটী উষ্ট্র ভাড়া করিয়া শিষ্য দিগকে সঙ্গে লইয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন।

হরিদাস কে ও কি প্রকারে তিনি যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। দিল্লীর এক জন ব্রাহ্মণ পশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজধানীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্বে তিনি হরিদাসের নিকট কয়েক বৎসর যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়া ছিলেন। হরিদাস যখন রাজপুতনায় গিয়াছিলেন, তখন যোগীও সেখানে উপস্থিত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তখন নগরবাসীরা হরিদাসের পরিচয় জানিবার জন্য ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি এই ব্রাহ্মণকে চিনি। কুরুক্ষেত্রে ইহাঁর আশ্রম। আমি ৫ বৎসর এই যোগীর সঙ্গে ফিরিয়াছি। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া শূন্যে উঠিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন। কিরূপে শূন্যে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাও আমি জানি। প্রত্যহ অর্দ্ধসের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে, এবং প্রত্যহ একবার করিয়া শরীর ওজন করিয়া দেখিবে। শূন্যে উঠিবার পূর্ব্বে বিরেচক ঔষধ দ্বারা অন্ত্র ধৌত করিয়া অনশনে থাকিতে হয়। প্রথমে বাম নাসিকায় ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিবে। এক এক বার কিঞ্চিৎ বায়ু গ্রহণ করিবে, এবং সেই বায়ু আর গিলিবে না। এইরূপে দশ হাজার বার মন্ত্র জপ করিতে যত সময় লাগে, তত সময় পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিবে; কিন্তু একবারও নিশ্বাস ফেলিবে না। প্রত্যহ বায়ু ভক্ষণ করিতে পারিলেও মন যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে শরীর ঊর্দ্ধে উঠিবে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এইরূপ ভাবিতে

হইবে, যেন ভ্রূযুগলের সন্ধি-স্থানে দৃষ্টি সম্বদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইলেই মৃত্তিকা হইতে দেহ শূন্যে উঠিয়া পড়িবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে কিছু কষ্ট বোধ হয় বটে, কিন্তু একবার অভ্যাস হইলে আর কোন কষ্ট থাকে না।" ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হরিদাস ও তাঁহার যোগাভ্যাস সম্বন্ধে যাহা কহিয়া ছিলেন, হরিদাসও বৈলো সাহেবের নিকট তাঁহার ঠিক সেইরূপ আত্ম-পরিচয় ও যোগের প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া ছিলেন। সমাধি হইতে উঠিলে হরিদাস কয়েক দিন সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহাকে কিয়দ্দিন নির্জ্জন অন্ধকার-গৃহে বাস করিতে হইত। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক মল-মূত্র নির্গত হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহার অন্ত্রের কোন স্থান পচিয়া যায় নাই।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাপ্তবয়স্ক কুমার বাহাদুর নবনিহাল সিংহের বিবাহ। এই উৎসব উপলক্ষে বহুসংখ্যক রাজা ও রাজমন্ত্রী লাহোরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ছিলেন। এই সময়ে হরিদাসও শিষ্য দিগকে সঙ্গে লইয়া ঘটনা ক্রমে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে ধ্যানসিংহ রণজিৎ সিংহকে বলিলেন "মহারাজ! এক জন সিদ্ধপুরুষ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে চারি মাস কাল ভূগর্ভে নিহিত রাখিয়া ছিলাম। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।" রণজিৎ সিংহ এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে দেখাইতে পার, তবে আমি বিশ্বাস করিতে পারি"। ধ্যানসিংহের আজ্ঞানুসারে হরিদাস শিষ্যগণ লইয়া রাজসভায় উপস্থিত

হইলেন। তৎকালে রণজিৎ সিংহ কয়েক জন সমর-কুশল ফরাসী সেনাপতির সহিত রাজ্য সম্বন্ধে কি পরামর্শ করিতে ছিলেন। পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মহারাজ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে যথোচিত আসন প্রদান করিলেন; এবং দুই এক কথার পর ফরাসী সেনাপতি দিগকে বিদায় দিয়া সাধুর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তখন ধ্যানসিংহ হরিদাসকে সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে বলিলেন। হরিদাস বলিলেন "মহাশয়, আমার এক নিবেদন আছে। এবার আমাকে মৃত্তিকার ভিতরে পুতিয়া রাখিবেন না। কারণ, তাহাতে আমার প্রাণের আশঙ্কা আছে। আমি যখন পুষ্করে মৃত্তিকার ভিতর তিন মাস প্রোথিত ছিলাম, তখন কীটে আমার শরীর খাইয়া দিয়াছিল। দেখুন এখনও তাহার শুষ্ক ক্ষত-চিহ্ন রহিয়াছে। আপনি আমাকে একটী লৌহ-সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া একটী বৃহৎ গাছে ঝুলাইয়া রাখুন; তাহা হইলেই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।" কিন্তু রণজিৎ সিংহ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হরিদাস আশ্রমে গিয়া সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার জিহ্বার নিম্নদেশ কাটা ছিল। কারণ, সমাধির সময় জিহ্বা উল্টাইতে হইলে চর্ম্ম কাটিয়া জিহ্বা আল্‌গা করা আবশ্যক। প্রত্যহ অল্প মাত্রায় জঙ্গী হীরতকী প্রভৃতি মৃদু বিরেচক দ্রব্য গুলি সেবন করিয়া দেহের ক্লেদ পরিষ্কার করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার প্রত্যহ প্রাতঃস্নানের নিয়ম ছিল।

স্নানের পূর্ব্বে মুখের ভিতর এক খানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পুরিয়া দিয়া তিনি অন্ননালী ও পাকস্থালী পরিষ্কৃত করিয়া আনিতেন। অন্ত্র পরিষ্কৃত করিবার জন্য নবদ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া জল টানিয়া লইয়া অন্য আর একটী দ্বার দিয়া জল বাহির করিয়া দিতেন। আহারের মধ্যে জল-মিশ্রিত অর্দ্ধসের দুগ্ধ। প্রথম দিন নিত্য অভ্যাসের অনুবর্ত্তী হইয়া খাঁটি অর্দ্ধসের দুগ্ধ পান করিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত জলের ভাগ অধিক করিয়া দুগ্ধের ভাগ অল্প করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবসে হরিদাস নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিলেন।

অষ্টম দিবস উপস্থিত হইল। হরিদাস মহারাজের রাজসভায় আসিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি প্রস্তুত হইয়াছি, অনুমতি পাইলেই সমাধিস্থ হইয়া মৃত্তিকায় প্রবেশ করি"। রাবী নদীর তীরে একটী সুরম্য উদ্যান ছিল। ইহার নাম সর্দ্দার গণ্ডলা সিংহ ভরনীয়াওয়ালা। এই উদ্যানের মধ্যে একটী বারদ্বারী স্থান আছে। মহারাজ সন্ন্যাসীকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। স্বয়ং রণজিৎ সিংহ, তাঁহার পুত্র কোরক সিংহ ও পৌত্র নবনিহাল সিংহ, সেরসিংহ, সুচেতসিংহ, মন্ত্রী ধ্যানসিংহ, কোষাধ্যক্ষ বলরাম মিশ্র এবং ভেঞ্চুরা প্রভৃতি কয়েক জন সাহেব হরিদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন হরিদাস কহিলেন "ধর্ম্ম সাক্ষী রহিলেন; দেখিবেন, যেন আমাকে চল্লিশ দিনের অধিক মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা না হয়।" মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া

কোন সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমে নাপিত আসিয়া হরিদাসের নখ, মাথার চুল, দাড়ী ও গোঁপ কাঁমাইয়া দিল। হরিদাস বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে তাঁহার উদরে এখনও ক্লেদ আছে। এজন্য তিনি তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত ও ষাট্ হাত দীর্ঘ একখানি বস্ত্র গিলিয়া ফেলিয়া সমস্ত ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া আনিলেন। তৎপরে তিনি হৃদ্‌পদ্মে হস্তদ্বয় রাখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে শিষ্যেরা তাঁহার চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকায় ঘৃত মাখাইয়া দিয়া তুলা ও মোম দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয় পথ বন্ধ করিয়া দিল। তখন হরিদাস জিহ্বা উল্‌টাইয়া তালুর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। শিষ্যেরা হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিল, স্পন্দন নাই এবং শরীরও শীতল হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন শিষ্যগণ সন্ন্যাসীর গাত্রে এক খানি শুভ্রবর্ণ বস্ত্র জড়াইয়া দিয়া সংযোগ স্থল সেলাই করিয়া দিলেন, এবং রণজিৎ সিংহ তাহাতে স্বনামের একটী মোহর লাগাইয়া দিলেন। রণজিৎ সিংহের কোষাধ্যক্ষ বলরাম মিশ্র এই অবস্থায় সাধুকে একটী কাষ্ঠের সিন্ধুকে পুরিয়া স্বহস্তে তাহার চাবি বন্ধ করিলেন। কুলুপের উপর আর একটী মহারাজের সিল মোহর দেওয়া হইল। অনুচরগণ সিন্ধুকটী লইয়া মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিল। ইহাতেও রণজিতের বিশ্বাস হইল না। তখন তিনি সমাধি-ক্ষেত্রের উপর যব বুনাইয়া ও বারদ্বারীর দ্বার ইষ্টক দ্বারা গাথাইয়া দিয়া চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী রাখিয়া দিলেন। মোহর ও চাবি কাহারও নিকট না রাখিয়া মহারাজ স্বয়ং তাহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

তিন চারি দিনের মধ্যে যবের অঙ্কুর বাহির হইয়া গেল। মাসাধিক অতীত হইলে গাছ গুলি বিলক্ষণ বড় হইয়া বায়ু ভরে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। ঊনচত্বারিংশ দিবসে রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ওয়েড্ সাহেব কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য লইয়া লাট সাহেবের আদেশ ক্রমে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে মহারাজ আজি-জুদ্দিনের দ্বারা ওয়েড্ সাহেবকে সমস্ত গল্পটী শুনাইলেন। পর-দিন প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী উঠিবেন শুনিয়া সাহেবেরাও চলিয়া না গিয়া মহারাজের অতিথি হইয়া রহিলেন। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল। বারদ্বারীর উদ্যান লোকাকীর্ণ হইতে লাগিল। রণজিৎ সিংহ ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু এবং প্রধান প্রধান কর্ম্ম চারিগণ, কাপ্তেন ওয়েড্, ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার মরে, জেনারল্ ভেঞ্চুরা ও প্রায় চারি শত ইংরাজ সৈন্য বারদ্বারীর সম্মুখে উপস্থিত। বলরাম মিশ্র কার্য্যাধ্যক্ষ, তিনি বারদ্বারীর নূতন প্রাচীর ভাঙ্গাইলেন। সমাধি-স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। যবের বড় বড় ঝাড় বাঁধিয়া গিয়াছে। মাটী খুঁড়িয়া সিন্ধুক বাহির করা হইল। রণজিৎ সিংহ চাবি দিলেন। বলরাম মিশ্রও মোহর ভাঙ্গিয়া সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলেন, ভিতরে হরিদাস বস্ত্রাবৃত হইয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে যে ভাবে রাখা হইয়া ছিল, তিনি ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছেন। শিষ্যেরা হরিদাসের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, হরিদাসের সংজ্ঞা নাই। রেসিডেণ্ট্ সার্জ্জন ম্যাক্‌গ্রেগর ও ডাক্তার মরে উভয়েই সন্ন্যাসীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নাড়ী নিশ্চল ও হৃদ্-পিণ্ড নিষ্কম্প। শিষ্যেরা তালু হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া

আনিয়া দেখিল, উহা মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় মোটা, গোল ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা তাহাতে ঘৃত লেপন করিয়া সাধুর মাথায় পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ জল ঢালিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিবার পর এক খানি বড় রুটী অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে মাথার উপর বসাইয়া দিল। তাহার পর চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও নাসিকার তুলা ও মোম খুলিয়া দিয়া জোরে ফুৎকার দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেহে প্রাণ বায়ু উপস্থিত হইল, এবং যোগীও চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহ সাধুর নিকট বসিয়া ছিলেন। সাধুও মহারাজকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার সহিত মৃদুস্বরে দুই একটী কথা কহিতে লাগিলেন। সাহেব মণ্ডলী দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ডাক্তার মরে স্বহস্তে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লইলেন। ওয়েড, ম্যাক্‌গ্রেগর ও মরে সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। সাহেবদের ইচ্ছা যে তিনি কলিকাতায় গিয়া একবার ইহা গভর্ণর জেনারল্‌কে দেখান। হরিদাস বলিলেন্ "যদি আপনারা সমস্ত কলিকাতা নগরী আমাকে পুরস্কার দেন, তাহা হইলে আমি কলিকাতায় গিয়া এক বৎসর কাল মৃত্তিকার ভিতর সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে পারি। নতুবা আপনাদের একটু আমোদের জন্য আমি এত কষ্ট সহ্য করিব কেন?" সাহেবেরা তাহাতে নিরুত্তর হইয়া আর অধিক অনুরোধ করিলেন না। রণজিৎ সিংহ হরিদাসের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে মণিময় কুণ্ডল, কনকহার স্ফটিকমালা, প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং

দুই হাজার টাকার মূল্যের এক খানি উৎকৃষ্ট শাল পুরস্কার দিলেন।

হরিদাসের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। তিনি জলের উপর দিয়া যথেচ্ছ গমনাগমন ও চক্ষু মুদিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন। একবার বর্ষাকাল উপস্থিত। রাবী নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার স্রোত এরূপ প্রবল যে, এক গাছি তৃণ ফেলিয়া দিলে বোধ হয় তাহা শতখণ্ড হইয়া যায়। সাধু সেই স্রোত অতিক্রম করিয়া পদব্রজে নদী পার হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং কয়েক জন সাহেব ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ১৮৩৪ সালে হরিদাস আজমীরে গিয়া স্পিয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহেন "আমি জলের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি, এবং চক্ষু বাঁধিয়া দিলে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারি।" স্পিয়ার সাহেব সাধুর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তখন হরিদাস তাঁহার সম্মুখে জলের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর মেজর সাহেবের অনুমতিক্রমে তাঁহার মুন্সী সুজাসিংহ বস্ত্র দ্বারা সাধুর চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন। হরিদাসও এক খানি পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলি দিয়া অবাধে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। স্পিয়ার সাহেব ইহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সম্প্রতি এইরূপ আর একটী কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই ঘটনাটী শুনিলে, হরিদাসের চক্ষু বাঁধিয়া পড়িতে পারিবার কথা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। কলিকাতায় কোন ভদ্র মহিলার মূর্চ্ছারোগ হইয়া

ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে তিনি যে কোন শব্দ কাণ দিয়া না শুনিয়া পেট দিয়া শুনিতে পাইতেন। রোগের প্রকোপে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন, এবং পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলি দিয়া পড়িতে পারিতেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি লিখিতেও পারিতেন। বর্ণাশুদ্ধির কিম্বা ছেদের ভুল হইলে তিনি না দেখিয়া ঠিক সেই বর্ণ কিম্বা ছেদ অঙ্গুলি দ্বারা মুছিয়া পুনর্ব্বার তাহা শুদ্ধ করিয়া লিখিতেন। মান্যতম ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, বাবু রাজেন্দ্র লাল দত্ত, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

একবার কতকগুলি ইংরাজ রণজিৎ সিংহকে কহিলেন "মহারাজ! আপনার হরিদাস এক জন প্রতারক। তাঁহার যোগবল ও সমাধিধারণ সকলই মিথ্যা। মৃত্তিকার ভিতরে পুতিয়া রাখা হইলে তাহার শিষ্যেরা প্রহরী দিগকে উৎকোচ দিয়া রাত্রিকালে তুলিয়া আনে। পরে যোগীর উঠিবার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে পুতিয়া আইসে"। এই কথা মহারাজের মনে লাগিল না। এক দিন তিনি জেনারল ভেঞ্চুরা ও ওয়েড্ সাহেবকে বলিলেন "ভাল, সন্দেহ রাখিয়া কাজ কি! আর একবার যোগীর পরীক্ষা লওয়া যাউক।" ওয়েড সাহেব ভেঞ্চুরাকে কহিলেন "আপনি সাবধানে হরিদাসকে পুতিবেন, এবং উঠিবার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে তুলিব"। রণজিৎ সিংহ হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়, আর এক বার আপনার সমাধিধারণ দেখিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

যে সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে হয় করুন। এবার আপনাকে দশ মাস কাল মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে হইবে।” হরিদাসও ,ঠে যে আজ্ঞা বলিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। অন্তর্ধৌতি ও যোগের অন্যান্য পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে প্রায় দশ বার দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। হরিদাস প্রস্তুত হইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন।

বেলা দুই প্রহর। হুজুরিবাগ লোকাকীর্ণ হইতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজ, প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও জেনারল ভেঞ্চুরা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ওয়েড্ সাহেব তখনও আসিতে পারেন নাই। সমাধির সময় উপস্থিত হইল। হরিদাস পূর্ব্বের মত তুলা ও মোম দিয়া চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা-রন্ধ্র বন্ধ করিলেন, এবং জিহ্বা উলটাইয়া মৃতবৎ হইয়া গেলেন। ভেঞ্চুরা যোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মৃত্যুর মত তাঁহার সমস্ত লক্ষণ হইয়াছে। তখন তাঁহাকে একখানি বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া স্থানে স্থানে রণজিতের স্বনামের মোহর করা হইল। এবারেও হরিদাসকে একটী কাষ্ঠের সিন্ধুকের ভিতর পুরিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইয়াছিল। সমাধি স্থানের উপর একটী সঙ্কীর্ণ গুম্বজ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া চতুর্দ্দিকে বিশ্বস্ত প্রহরী রাখিয়া দেওয়া হইল। মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তঞ্জামে চড়িয়া সমাধি-স্থান দেখিতে যাইতেন। পাছে হরিদাসের শিষ্যেরা প্রহরী দিগকে উৎকোচ দিয়া ও তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া পুনর্ব্বার উঠিবার পূর্ব্ব দিন মৃত্তিকার ভিতর রাখিয়া আইসে, এই সন্দেহ করিয়া মহারাজ সমাধি-মগ্ন সন্ন্যাসীকে দুই বার মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া দেখিয়া ছিলেন।

তাঁহাকে যে ভাবে রাখা হইয়াছিল, তিনি ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া ছিলেন। দেখিতে দেখিতে দশ মাস পূর্ণ হইয়া গেল। রণজিৎ সিংহ লুধিয়ানায় ওয়েড্ সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ওয়েড্ সাহেব মহারাজের সহিত সমাধি-ক্ষেত্রে গিয়া সন্ন্যাসীকে তোলাইলেন। সকলেই দেখিল, মৃত দেহের ন্যায় তাঁহার শরীর শুষ্ক, নিস্পন্দ ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই মৃত শরীরে আবার জীবন সঞ্চার হইল। তখন ওয়েড্ সাহেব নিস্তব্ধ ও নিরুত্তর হইয়া হিন্দুজাতির যোগবলের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হিন্দু দিগের ধর্ম্মরাজ্যে বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল, দ্বারে দ্বারে কল্যাণ-রচনা ঝুলিতে লাগিল, এবং শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে লাহোর নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল লর্ড অকল্যাণ্ড্ কোন বিশেষ সন্ধির জন্য ডাক্তার ড্রমণ্ড, ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগর, ম্যাক্‌নাটন, অস্‌বরণ প্রভৃতি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে রণজিৎ সিংহের রাজসভায় পাঠাইয়া ছিলেন। তৎকালে মহারাজ লাহোরের নিকটবর্ত্তী অদীননগরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। রাজনৈতিক কথা বার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে রণজিৎ সিংহ সাহেব দিগকে হরিদাসের আশ্চর্য্য ক্ষমতার গল্প করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে হরিদাসও সেই দিন শিষ্যগণ লইয়া অমৃতসর হইতে অদীননগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবেরা উৎসুক হইয়া হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাসায় চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিলেন, হরিদাস একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরে পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া

আছেন। গৃহতল বহুমূল্য গালিচায় আবৃত, ও খাটের উপর বিচিত্র রেশমের শয্যা। তাঁহার সম্মুখে দুইটী পানপাত্র ও এক খানি পুস্তক। বাম ভাগে একটী জলপাত্র, দুইটী ঝুলি ও এক খানি গেরুয়া বস্ত্র। মেজের উপর আর এক খানি পুস্তক ও রণজিৎ-সিংহ-প্রদত্ত কাশ্মীরী শাল। পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনৈক শিখ ধীরে ধীরে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। পূর্ব্বে সমাধি হইতে উঠিলে পর মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া ছিলেন, আজি তিনি তন্মধ্য হইতে কনকহার ও রত্নকুণ্ডল পরিয়া আছেন। সাহেব দিগের সহিত হরিদাসের অনেক কথা বার্ত্তা হইবার পর ইহা স্থির হইল যে, লাহোরে গিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আর এক বার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইবেন। হরিদাস তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন, "এবারে আমাকে কত দিন মৃত্তিকার ভিতরে থাকিতে হইবে?" সাহেবেরা কহিলেন, "আমরা এক মাস লাহোর থাকিব। আপনাকে এই এক মাস কাল মাটীর ভিতর থাকিতে হইবে।" রণজিৎ সিংহ একটী ঘর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লাহোরে একটী সুরম্য উদ্যানে একটী পাকা গোল ঘর ছিল। গৃহটী অধিক বড় নয়, পরিধিতে প্রায় ২০ ফিট্ হইবে। সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে হরিদাস যোগের পূর্ব্বানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ২৫এ জুন মৃত্তিকায় প্রবেশ করিবার দিন স্থির হইল। কিন্তু সে দিন তিনি সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "এখনও আমার সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান শেষ হয় নাই। কল্য দুই প্রহরের সময় আমি সমাধি ধারণ করিব"। পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে হরিদাস নিজ ইষ্ট

দেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুই প্রহর উপস্থিত হইল। অন্যান্য বার সমাধির পূর্ব্বে তিনি যেরূপ প্রফুল্ল ও হৃষ্ট-চিত্ত থাকিতেন, এবার তাঁহাকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া গেল না। দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন মনে মনে বড় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। উদ্যান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হরিদাস সম্মুখে অসবরন্ সাহেবকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "আমি যোগে বসিতে যাইতেছি ; কিন্তু আমার পুর-স্কারের কথা কিছু ত আপনারা বলেন নাই।" সাহেবেরা উহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, এবং কহিলেন "আপনি যে পুর-স্কারের আশা করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। আপনি সিদ্ধ পুরুষ ; এজন্য আমরা ভাবিয়া ছিলাম, অর্থের কথা কহিলে আপনি রুষ্ট হইবেন! ভাল, আমরা এক সপ্তাহ কাল আপনাকে মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখিব। তাহার পর তুলিলে যদি আপনি পুনর্জীবিত হন, তাহা হইলে আমি আপনাকে দেড় হাজার টাকা নগদ ও বার্ষিক দুই হাজার টাকা লাভের একখানি জাইগির পুরস্কার দিব।" টাকার আপত্তি মিটিল। কিন্তু হরিদাস আর একটী আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "আমি সমাধিতে বসিলে আমার রক্ষার জন্য আপনারা কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, এবং আমি যে চাতুরী করিতেছি না, তাহা জানিবার জন্য আপনারা কিরূপে সতর্ক হইবেন?" অস্‌বরন্ সাহেব চারিটী কুলুপ দেখাইয়া কহিলেন, "ইহার দুইটী আপনার সিন্ধুকে ও দুইটী গুম্বজের দ্বারে লাগাইব। ইহার দুইটী চাবি আপনার লোককে দিব এবং দুইটী আমি নিজে রাখিব। কিন্তু সমস্ত কুলুপ গুলিতে আমার নিজের

সিল মোহর লাগান থাকিবে। গৃহের বহির্দ্বার ইষ্টক দিয়া গাঁথাইয়া দিব, এবং অষ্টপ্রহর আমাদের নিজের প্রহরী চৌকী দিয়া বেড়াইবে"। হরিদাস বলিলেন, "প্রত্যেক কুলুপের দুইটা করিয়া চাবি থাকা চাই। এক একটী চাবি আপনাদের নিকট থাকিবে; আর এক একটী আমার শিষ্য দিগের নিকট থাকিবে; এবং আপনারা এখানে যবন প্রহরী রাখিতে পারিবেন না"। এই সকল কথা শুনিয়া সাহেবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। হরিদাসও তাঁহাদিগকে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা ফিরিঙ্গী, নাস্তিকের চূড়ান্ত। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মান না। লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য তোমরা লাহোরে আসিয়াছ। কিন্তু এমন আশা করিও না যে, তোমাদের সাধ পূর্ণ হইবে। লোক সমাজে আমার যে প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তাহা আর ঘুচিবার নয়"। অস্‌বরন্ সাহেব হরিদাসকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা সাহেবেরা আপন আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনার কাজ ভাল হয় নাই। আপনি যদি সমাধিতে না বসেন, তাহা হইলে লোকে আপনাকে প্রতারক বলিয়া নিন্দা করিবে"। হরিদাস কহিলেন "মহারাজ! সমাধিধারণ আমার পক্ষে তুচ্ছ কর্ম্ম। সুখের নিদ্রা ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। আপনি অনুরোধ করিতেছেন, সেজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রভাতে সমাধিতে

বসিব। কিন্তু আপনার নিকট আমার ভিক্ষা এই, এবার যদি দুষ্টের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরাজ দিগকে যোগ দেখাইবার জন্য আর আমাকে কখনও অনুরোধ করিবেন না। আমার মনের কথা বলিতেছি আমি উহাদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। তাহারা কেবল আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে। কৌশলে আমার প্রাণ নষ্ট করাই তাহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।" মহারাজ অস্‌বরন্ সাহেবের নিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন; এজন্য আর কৌতুক দেখিতে চাহিলেন না। সুতরাং হরিদাসেরও আর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল না।

অনেকে এবারে হরিদাসকে সমাধির পূর্ব্বে কিছু বিষণ্ণ ও দুই একটী আপত্তি তুলিতে দেখিয়া তাঁহাকে ভণ্ড ও প্রতারক মনে করিয়া ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভণ্ড ও প্রতারক নহেন। যখন তিনি বারম্বার সমাধি-ধারণ করিয়া ছিলেন, তখন তিনি যে এবারে সমাধি-ধারণ করিতে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছুক হইলেন, তদ্বিষয়ে একটী নিগূঢ় কারণ ছিল; এবং ধ্যানসিংহ ভিন্ন লাহোরে আর কোন ব্যক্তি সেই কারণটী কি, তাহা জানিত না। তিনিই সেই দিনের সেই কাণ্ড ঘটাইবার মূল। ধ্যানসিংহ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, ইংরাজেরা কাহারও সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব রাখিতে পারিবেন না। এজন্য ইংরাজেরা সন্ধির প্রস্তাব করিলে মন্ত্রী ধ্যানসিংহ মন্ত্রণা দিয়া মহারাজের অসম্মতি জন্মাইয়া দিতেন। শা সুজা বহুকাল হইতে রাজ্যভ্রষ্ট

হইয়া ছিলেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসাইবার জন্ত ইংরাজেরা রণজিতের সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়া ছিলেন। ধ্যানসিংহ গোপনে মহারাজের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন; এবং হরিদাসকেও এই বলিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, ইংরাজেরা পঞ্জাব জয় করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে। কিন্তু আপনি জীবিত থাকিতে মহারাজের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। তাই দুষ্টেরা কৌশলক্রমে আপনার প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। হরিদাসের মনে এই বিশ্বাসটী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যথার্থই যদি ইংরাজ দিগের দুরভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে যোগে বসিলেই প্রাণ যাইবে; না বসিলেও মান থাকিবে না। প্রাণ দিয়া মান রাখি, কিম্বা মান হারাইয়া প্রাণ বাঁচাই, এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া হরিদাস কিছু ভীত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভাবিলেন, প্রাণের ভয়ে মান দিয়া কলঙ্ক কিনিব কেন! প্রাণ যায় যাউক। এই বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইতে অগত্যা সম্মত হইয়া ছিলেন। কিন্তু অস্‌বরন্ সাহেব আর কৌতুক দেখিতে চাহিলেন না।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ হরিদাসের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। মহারাজ পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন "চল্লিশ দিন আপনাকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিব। তাহার পর তুলিলে যদি আপনি জীবিত থাকেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সপরিবারে আপনার শিষ্য হইয়া থাকিব; এবং চির কালের জন্ত আপনি লাহোরে থাকিবেন।" সাধু কি করিতেছেন,

কি খাইতেছেন, কেমন আছেন, ইত্যাদি কুশল সংবাদ লই-বার জন্য মহারাজ প্রত্যহই তাঁহার নিকট লোক পাঠইতেন। এক দিন রণজিৎ সিংহ শুনিলেন, জিতেন্দ্রিয় হরিদাসের ইন্দ্রিয়-দোষ জন্মিয়াছে। রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনও সেই সময়ে তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ক্রুদ্ধ হই-বার কারণ কি, বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। জনরব যে মহারাণীর আদেশক্রমে কয়েক জন দূত আসিয়া সন্ন্যাসীর যথেষ্ট অবমাননা করিয়া ছিল। হরিদাস ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়া ছিলেন, "তোরা পাপিষ্ঠ মহারাজকে বলিস, তাহার বংশে বাতি দিবার জন্য এক জনও বাঁচিয়া থাকিবে না। পাপীয়সী চাঁদরাণীকেও ভিখারিণীর ন্যায় পথে পথে ফিরিতে হইবে। তাহারা আমার সাধন ও সদভিপ্রায় না বুঝিয়া যেমন দুষ্কর্ম্ম করিল, বিধাতা ইহার উচিত দণ্ড অবশ্যই দিবেন"। পরদিন প্রাতঃকালে শুনিতে পাওয়া গেল, হরিদাস শিষ্য-গণ লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। একটী ক্ষত্রিয়া রমণী তাঁহার নিকট যাতায়ত করিত; তাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। ইহা শুনিয়া রণজিৎ সিংহ ভাবিলেন, নৈসর্গিক বিড়-ম্বনা অতিক্রম করা সহজ কর্ম্ম নহে। তখন হরিদাসের উপর তাঁহার কিছু অশ্রদ্ধা ও ক্রোধ জন্মিয়া গেল। তৎপরে হরিদাস কোথায় চলিয়া গেলেন. কিছুই স্থির হইল না। কয়েক বৎসর পরে রামতীর্থ নামক হরিদাসের জনৈক শিষ্য আসিয়া মহারাজকে হরিদাসের মৃত্যু সংবাদ দিল। হরিদাসের মৃত্যুঘটনা বড় আশ্চর্য্য। এক দিন তিনি শিষ্য দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমার জীবনকাল পূর্ণ হইয়াছে। আমি

অদ্য সমাধিতে দেহত্যাগ করিব। তোমরা সকলে নিকটে এস"। শিষ্যেরা দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। হরিদাসও একটী নির্ঝরের ধারে যোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। নির্ঝরের কল কল ধ্বনিতে তাঁহার আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না। এরূপ অদ্ভুত মৃত্যুর কথা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা শান্তিপুরের বিশ্বনাথ ক্ষেপাকে জানেন, তাঁহারা কখনই হরিদাসের মৃত্যু ঘটনা অদ্ভুত বলিয়া অবিশ্বাস করিবেন না। শান্তিপুরে এই ব্যক্তিকে লোকে "বিশে পাগলা" বলিত। বিশ্বনাথের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে সে পাড়ার ভদ্রলোক দিগকে ডাকিয়া বলিল "ওরে! বিশে আজ মর্‌বে, তোরা দেখ্‌বি আয়"। এই বলিয়া বিশ্বনাথ জাহ্নবীতীরে শয়ন করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল; এবং দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গেল। প্রায় ২০।২৫ বৎসর হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আজিও জীবিত আছেন। হিন্দুজাতির যোগ-শাস্ত্র ও যোগ-বল ধন্য! যাহা শুনিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায় ও সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহাও যোগবলে সাধিত হইয়া থাকে।

জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবার

ও

স্যার টমাস রোর দৌত্য।

কালের গতি কুটিল, এবং দৈবের গতিও দুর্নিরীক্ষ্য। যে ইংরাজ যৎসামান্য পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বণিক্ বেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা আজ সমগ্র ভারতভূমির একমাত্র অধীশ্বর। কেশরি-চিহ্নিত ব্রিটিশ-পতাকা আজ ভারত ক্ষেত্রে উড্ডীন হইয়া বিজয়ী ইংরাজের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। উত্তরে হিমাদ্রি হইতে দক্ষিণে কন্যা-কুমারিকা, এবং পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে পশ্চিমে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি আজ ব্রিটিশ সিংহের বিজয়-লব্ধ সম্পত্তি; বীর-কেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যৎ-বাণী আজ অসম্ভব সত্য ঘটনায় পরিণত। অতুল সাহস, অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অনন্ত অধ্যবসায়, অক্ষয় উৎসাহ-শক্তি, ও অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশল ইংরাজের নিত্য সহচর বলিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও স্বদেশ-হিতৈষিতা যাঁহাদিগের বলবতী, এবং স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনোদ্দেশে দুস্তর জলধি অতিক্রম করিয়া দূরদেশকেও যাঁহারা স্বদেশ বলিয়া মনে করেন, ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন না হইবেন কেন! সুরাটই ইংরাজদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয়-গিরি। ঘটনা-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া তাঁহারা এই স্থলেই সাহস, উদ্যম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বাণিজ্য-বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনে এই

স্থানেই কখনও বা তাঁহারা অপার আনন্দ-নীরে ভাসমান হইয়া ছিলেন, কখনও বা অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। যে উদ্যমশীলতা ও দুঃখসহিষ্ণুতা ইংরাজদিগের প্রত্যেক রক্তকণিকার সহিত সংমিশ্রিত, সেই উদ্যম ও সহিষ্ণুতা বলেই তাঁহারা সমগ্র ভারতভূমির একমাত্র অধীশ্বর হইয়া আধিপত্য করিতেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক এক দল সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বণিক্ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন। তাপ্তী নদীর মোহনার নিকট স্থুরাট নামক একটী প্রধান নগর ছিল। তাঁহারা কয়েক খানি জাহাজ ও কিছু পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়া প্রথমতঃ ঐ স্থানেই আপনাদিগের কুঠি নির্ম্মাণ করেন। জলপথে বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানি রপ্তানী করিবার স্থুবিধা দেখিয়া তাঁহারা স্থুরাট নগরই মনোনীত করিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালে দিল্লী, আগরা ও আজমীর এই তিনটী মহানগরী মোগল সম্রাট দিগের বিলাস-ভূমি ছিল। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইত তাহা মোগল দিগের সম্ভোগের জন্য দিল্লী, আগরা ও আজমীরে গিয়া বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। স্থুরাটে ইংরাজদিগের কুঠী স্থাপন করিবার আর একটী উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা অল্পায়াসেই তথা হইতে রাজধানীতে পণ্যদ্রব্যাদি চালান দিতে পারিবেন। কারণ, স্থুরাট হইতে দুইটী প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়া, একটী দিল্লী ও আগরা এবং অন্যটী আজমীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাত আট বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বাণিজ্য-লক্ষ্মী

ইংরাজ দিগের প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা বিলাত হইতে এদেশে ছুরি, কাঁচি, তরবারি, ও নানাবিধ ছিট বস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রী গুলি আমদানী করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এদেশ হইতে বিলাতে তুলা, রেশম, মসলা ও মহামূল্য মুক্তারত্নাদি রপ্তানী করিয়া লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় দিগের নিকট তাহা-দিগকে দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেন।

কিন্তু অধিক দিন তাঁহারা শান্তিসহকারে বাণিজ্য করিতে পান নাই। তৎকালে সুরাট মোগল বাদসাহের অধিকার-ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ও নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল পণ্যদ্রব্য আমাদানি রপ্তানি হইত, তাহাদিগের উপর এত অধিক পরিমাণে মাশুল নির্দ্ধারিত হইত যে, ইংরাজেরা তাহা সহজে দিতে পারিতেন না। কখন কখন বিনা কারণে জরিমানা আদায় করিয়া লওয়া হইত। তৎকালে যিনি সুরাটে মোগল দিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনিও কখন কখন ইংরাজ দিগের উৎকৃষ্ট বাণিজ্য-দ্রব্য গুলি মূল্য না দিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। তৎকালে কোন ইংরাজ এদেশে প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি মোগল কর্ম্মচারিগণের হস্তগত হইত; এবং যদি কোন জাহাজ সুরাট বন্দরের অদূরে জলমগ্ন হইত, তাহা হইলে তাহাও তাঁহাদিগের অধিকার-ভুক্ত হইত। সুতরাং এইরূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইংরাজ-বণিক দিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইত। এরূপ উপদ্রবের কথা লিখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরেরা মোগল রাজপুরুষ দিগকে অনেক আবেদন পত্র পাঠাইয়া

ছিলেন; কিন্তু সকলই বিফল হইয়া ছিল। তখন মোগল-সম্রাট-শিরোভূষণ মহাত্মা আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্যার টমাস্ রো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষকে তাঁহার নিকট এক খানি আবেদন পত্র দিয়া দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

স্যার টমাস্ রো ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী এসেক্স সায়ারে লোলেটম্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত ম্যাগ্‌ডেলেন কলেজে তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি বহুবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন। মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে জন্মিয়া লণ্ডন নগরের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ে গতায়াত করিলে মনুষ্যের যেরূপ সর্ব্ব-গুণ-সমন্বিত হওয়া সম্ভব ছিল, রো সাহেবও ঠিক সেই রূপ সর্ব্ব-গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সুচতুর,শ্রমশীল, অধ্যবসায়- সম্পন্ন, স্বদেশ-হিতৈষী ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি মধুর ও বাগ্মিতা-শক্তি বড় বলবতী ছিল; এবং যুক্তি-গর্ভ বচন-পরি-পাটি দ্বারা তিনি শীঘ্র সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। যিনি স্বদেশের হিত-সাধনে বিপুল বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ক্ষমতাশালী ও যথেচ্ছাচারী জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়া তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ ভাজন হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি কখনই এক জন সামান্য লোক নহেন। বলিতে কি, তাঁহার সুরাটে আগমনই ইংরাজ দিগের এদেশে অভ্যুদয়ের মূলসূত্র। রোর পূর্ব্বে হকিন্স নামক জনৈক সাহেব বাণিজ্য কার্য্যে সুবিধা করিবার জন্য প্রথম জেম্‌সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র লইয়া

জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি মোগল কর্ম্মচারী দিগের বিদ্বেষ ও শত্রুতা ভাজন হইয়া অভিপ্রেত সাধনে বিফল-প্রযত্ন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এজন্য ইংলণ্ডাধিপতি রো সাহেবকে সর্ব্ব-গুণ-বিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দৌত্য কার্য্যে মনোনীত ও নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ তারিখে "লায়ন" নামক এক খানি বৃহৎ অর্ণবযান আরোহণ করিয়া রো সাহেব কয়েক জন ইংরাজ সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডের তটভূমি পরিত্যাগ করেন। তৎকালে ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আসিতে হইলে আফ্রিকার দক্ষিণবর্ত্তী উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইত। তাহাতে বহু কষ্ট পাইতে হইত; এবং পৌঁছিতে প্রায় ছয় মাস কাল লাগিত। ২৪ শে আগষ্ট তারিখে "লায়ন" সকোট্রা দ্বীপে উপস্থিত হইলে রাজদূত রো সাহেব তথায় সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিলেন। তৎপরে জাহাজ সকোট্রা পরিত্যাগ করিয়া সুরাট বন্দর অভিমুখে যাইতে লাগিল। মাসাধিক অতীত হইলে পর সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইল। সুরাট নগরীও রাজদূতের সম্বর্দ্ধনার জন্য উৎসবময়ী হইয়া উঠিল। রাজদূতের উপযোগী বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া রো সাহেব সুরাটে অবতীর্ণ হইলেন। তৎ-কালে যে সকল জাহাজে ইংরাজ দিগের পণ্যদ্রব্য আসিত, তাহারা বিচিত্র পতাকা ও বিবিধ মনোহর পুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইয়া নদীর বক্ষে ভাসমান হইতে লাগিল। এক শত ইংরাজ নাবিক তাঁহাকে সসম্ভ্রমে জাহাজ হইতে নামাইয়া নগর মধ্যে লইয়া গেল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। নাবিকেরাও তাঁহার

বয়ঃক্রম অনুসারে ৪৮টী তোপধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিল। কি শুভক্ষণেই স্যার্ টমাস্ রো ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ছিলেন। অধিক কি, তিনিই এদেশে ইংরাজ জাতির সৌভাগ্য-সঞ্চারের প্রধান হেতু।

উচ্চপদস্থ মোগল কর্ম্মচারিগণ সুরাটে ইংরাজদিগের নিকট রো সাহেবের পরিচয় পাইয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মাননা করিলেন। কিন্তু এই রূপে সম্মানিত হইলেও তিনি একটী বিষয়ে অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া ছিলেন। তৎ-কালে এদেশে যে সকল বৈদেশিক জাতি যাহা কিছু আনিয়া নামাইতেন, তাহা মোগল সম্রাটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ সন্দেহ করিয়া খুলিয়া দেখিতেন। তদনুসারে আগন্তুক রো সাহেব ও তদীয় অনুচর বর্গের দ্রব্য-সামগ্রী একটী একটী করিয়া খুলিয়া দেখা হইল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য বিলাত হইতে যে সকল উপহার সামগ্রী আনা হইয়া ছিল, তাহাও তাঁহারা খুলিয়া দেখিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। রো সাহেব অনেক আপত্তি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। তখন তিনি আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী খুলিয়া দেখাইলেন। সুরাটে প্রথম পদার্পণ করিবার দিন রো বড় কষ্টে পড়িয়া ছিলেন। সুরাটে জনৈক আর্ম্মিনিয়াবাসীর এক খানি মদের দোকান ছিল। রোর এক জন রন্ধনকারী ইংরাজ ভৃত্য সুরাটে নামিয়াই মদের চেষ্টায় বাহির হইল। পথিমধ্যে ঐ দোকান খানি দেখিতে পাইয়া প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া চতুর্দ্দিকে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে সুরাটের নবাবের ভ্রাতা অশ্বারোহণ করিয়া নগর পর্য্যবেক্ষণ

করিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এ ব্যক্তি তরবারি বাহির করিয়া কহিল "আয়, কুকুর! চলিয়া আয়"; এই বলিয়া সে ইংরাজীতে বারম্বার গালাগালি দিতে লাগিল। নবাবের ভ্রাতা ইংরাজী বুঝিতেন না। এজন্য তিনি কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। কিন্তু পাচক সাহেব মদে মত্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হওয়াতে সতেজে তাঁহাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী অনুচরেরা সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বন্ধনালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রো সাহেব নিজ পাচকের এই রূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া নবাবের ভ্রাতাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "আপনি এই দুষ্টকে ইচ্ছামত শাস্তি প্রদান করুন।" কিন্তু তাহাকে আর কিছু অধিক দণ্ড না দিয়া তিনি রো সাহেবের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

রোর অবস্থিতির জন্য সুরাটে যথেষ্ট আয়োজন করা হইল; এবং তিনিও তথায় এক মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আজমীরে অবস্থান করিতে ছিলেন; সুতরাং রাজ-ধানী আগরা হইতে আজমীরে উঠিয়া আসিয়া ছিল। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে এদেশে রেলওয়ে ছিল না। সুতরাং দূরপথ যাইতে হইলে কষ্টের একশেষ হইত। অত্যন্ত কষ্ট করিয়া আগরায় না গিয়া নিকটে আজমীরে গেলেই বাদ-সাহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এই ভাবিয়া রাজদূত যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বাদসাহের জন্য যে সকল উপ-ঢৌকন সামগ্রী আনিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া সুরাটের মোগল কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা

রাজদূত ও তাঁহার উপহার সামগ্রী গুলি নিরাপদে আজমীরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া সুরাটে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার আজমীর যাত্রার তখনও কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া দেওয়া হইলে তিনিও নবাব সন্দর্শনে সুরাট পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বুরহানপুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে গাড়ী করিয়া দেওয়া হইল। বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে তিনি অনায়াসে আজ-মীর যাইতে পারিবেন, তাঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল। কিন্তু বুরহানপুরে যাইতে তাঁহার পনর দিন লাগিয়াছিল; এবং এই পনর দিন তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। মধ্যে এমন এক খানি বাড়ী পান নাই যে, তাহাতে তিনি এক দিনের জন্যও সুস্থির হইয়া বাস করেন। পথ-মধ্যে চিতোরের রাণাদিগের পার্ব্বতীয় রাজপুত প্রজাগণ পথিক দিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগের প্রাণ বধ করিত। এজন্য তিনি সুরাট হইতেই কয়েক জন অশ্বা-রোহী মোগল সৈন্য লইয়া গিয়া ছিলেন। অশেষ ক্লেশ পাইয়া অবশেষে তিনি বুরহানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগর সুরাটের ১২৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। তথায় জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার পারবেজ একটী সেনানিবেশের অধিনায়ক হইয়া দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেনা-পতি খাঁ খানানও তৎকালে তাঁহার সহিত বাস করিতে

ছিলেন। পাছে মালিক আম্বর সম্রাটের বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্যে একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন, এই জন্যই তাঁহারা বুরহানপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। রো সাহেব সম্রাটের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে আর একটি সুবিধা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন মোগল রাজ্যে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে, এবং মোগল সৈন্য দিগের মধ্যে বিলাতি তরবারির অত্যন্ত আদর ও ব্যবহার হইয়াছে। সুতরাং বুরহান্‌পুরে তরবারির একটী কুঠি খুলিলে ইংরাজ-দিগের প্রচুর লাভ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া তিনি রাজ-কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মতি লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন।

ইংলণ্ডীয় রাজদূতের উপস্থিতি-সংবাদ কুমার বাহাদুরের কর্ণগোচর হইবা মাত্র একজন কোতোয়াল রোর নিকট আসিয়া সংবাদ দিল, কুমার পারবেজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আপনাকে তথায় লইয়া যাইতে আমাকে প্রেরণ করি-য়াছেন। তখন রো সাহেবও কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতে ছিলেন। অতএব এইরূপ সুযোগ পাইয়া তিনি পরদিন প্রাতঃকালে কোতোয়ালের সহিত কুমার সমীপে যাত্রা করিলেন। কোতোয়াল ও শতাধিক মোগল অশ্বারোহী তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া লইয়া গেল। কুমার বাহাদুরের সভা-প্রাঙ্গণ দেখিয়া রো সাহেব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত দিন তিনি বিলাতে বসিয়া ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাট দিগের অতুল ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত গল্প শুনিয়া ছিলেন, আজ তাহা তিনি চক্ষের

সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সভাস্থলের ভিতর কুমার বাহাদুর বহু-মূল্য রত্ন-বিভূষিত একখানি অত্যুচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে পদমর্য্যাদা অনুসারে সর্ব্ব প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ জানু পাতিয়া বদ্ধ-কর-পুটে উপবিষ্ট। কুমারের অদূরে সুবেশ-পরিধায়ী প্রহরিগণ নিষ্কাশিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান। উর্দ্ধদেশে মণি মুক্তা-খচিত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ লম্বমান হইতেছে। অধোভাগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরক বিরাজিত আস্তরণ গৃহতলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। সম্মুখে রাজকুমারগণ হীরকাদি মণি মালায় সুসজ্জীভূত হইয়া পিতার রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক, মোগল বাদসাহদিগের বিলাস-ক্ষেত্র দিল্লী ও আগরা, অতুল ঐশ্বর্য্যে একদিন অমরাবতী হইয়া উঠিয়া ছিল। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজদূত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রো সাহেব দরবারে উপস্থিত হইলে কোতয়াল তাঁহাকে প্রাচ্যপ্রথা অনুসারে ভূমিতে লুটিয়া সেলাম করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি রাজদূত, ও এরূপ করা তাঁহার অনভ্যস্ত বলিয়া তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। অনন্তর সিংহাসনের তিন ধাপ নিম্নে থাকিয়া তিনি স্বদেশীয় পদ্ধতি ক্রমে একটু নত হইয়া কুমারের সম্মান রক্ষা করিলেন, এবং আরও বলিলেন "আপনার পিতা ভারতের সম্রাট; আমি তাঁহার নিকট ইংলণ্ডাধিপতির প্রেরিতদূত।" সভাসদবর্গ মনে করিয়া ছিলেন যে, কুমার তাঁহার উপর ক্রোধান্বিত হইবেন। কিন্তু তিনি তাহা না হইয়া বরং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেলাম করিলেন। পারস্যের

রাজদূতকে দেখিয়া আগ্রহ সহকারে ইংলণ্ডের রাজা জেম্‌স্‌ ও তত্রত্য অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্যার টমাস রো এপর্য্যন্ত বসিবার আসন পান নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর আর থাকিতে না পারিয়া যখন তিনি কুমারের পার্শ্বে বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন কুমার তাঁহার এতাদৃশ উচ্চাভিলাষ দেখিয়া ও হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "যদি স্বয়ং পারস্যের সাহা বা তুরস্কের সুলতান এই দরবারে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও এস্থানে আসিয়া বসিবার সাহস করিতে পারিতেন না"। তখন রো সাহেব নিরুপায় হইয়া নিকট-বর্ত্তী একটী রৌপ্যময় স্তম্ভের উপর ভর দিয়া বসিলেন; এবং সম্রাট ও কুমারের জন্য যে সকল উপহার সামগ্রী লইয়া গিয় ছিলেন, তাহাও একে একে দেখাইতে লাগিলেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট বিলাতী মদ্য ছিল। সামগ্রী গুলি মনোনীত হইল দেখিয়া রো সাহেব নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; এবং পারবেজও তাঁহার উপর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বুরহানপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে একটী কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন। তদনন্তর কুমার রো সাহেবকে বলিয়া দিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার পর আপনি রাজসভায় আসিবেন। আমি আপনার সহিত ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা কহিব।" তিনি সন্ধ্যার পর রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন; কিন্তু এক জন প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, "মহা-শয়ের সহিত আজ কুমার বাহাদুরের সাক্ষাৎ হইবে না।

আপনি প্রাতঃকালে যে কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট মদ্য উপহার দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই পান করিয়া জাঁহাপনা অত্যন্ত বদমেজাজ্ হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আর বাহিরে আসিবেন না; কারণ অন্তঃপুরে থাকিয়া তিনি মদ্য পান করিতেছেন"। রো সাহেব নিরাশ হইয়া অগত্যা প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার রাত্রিতেই তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হওয়াতে তাহাকে দশ দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়া ছিল। একটু সুস্থ হইলে পর তিনি আজমীরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। রো সাহেবের সহিত এক জন ধর্ম্মযাজক, এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ, এক জন চিত্রকর ও আর পনর জন ইংরাজ ভৃত্য ছিল। তিনি সহচর দিগকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে মাণ্ডব দুর্গ দেখিতে গেলেন। পূর্ব্বের ন্যায় মাণ্ডব দুর্গের আর শ্রী ছিল না। রোর আসিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আকবর তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। মাণ্ডব দুর্গের দুগ্ধ-ফেন-নিভ নর্ম্মদা-প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া রো ও তাঁহার অনুচরবর্গ বিমোহিত হইয়া গেলেন। মাণ্ডব দুর্গ ত্যাগ করিবার বার দিন পরে তাঁহারা চিতোর নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চিতোর শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। চিতোরের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। বীর-কেশরী প্রতাপ সিংহের অতুল প্রতাপ কাল-বশে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে; এবং বীর-ভোগ্যা চিতোর নগরী প্রতাপ হারাইয়া পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল পরিয়া রহিয়াছে। রাজপথ লোক-শূন্য, রাজভবন পরিবার-শূন্য ও উৎসবস্থান কোলাহল-শূন্য। পূর্ব্বে চিতোর নগরে যে

সকল কারু-কার্য্য-সম্পন্ন আশ্চর্য্য মন্দির ও গৃহাদি ছিল, তাহারা আজ মৃত্তিকার সহিত সমভূমি হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি এই চিতোরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। রো ও তাঁহার অনুচরবর্গ চিতোরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। তিনি চিতোরে গিয়া আর এক জন ইংরাজ পর্য্যটককে দেখিতে পাইলেন। ইহাঁর নাম টম্ কোরিয়্যাট্। ইনি অত্যন্ত মদ্য পান করিতেন। এক দিন লণ্ডনে কোন মদের দোকানে গর্ব্ব করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, ‘ভারতবর্ষে গিয়াই আমি মোগল সম্রাটকে দেখিব, এবং হস্তীর উপর চড়িয়া বেড়াইব। রোমে রঙ্গক্ষেত্রে যখন হস্তী দেখান হইত, তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে কেহ কখনও হস্তীর উপর চড়ে নাই। আমিই ভারতবর্ষে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে হস্তীর উপর চড়িব”। তিনি বাস্তবিকই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি জেরুসালেম যাত্রা করিয়াছিলেন; এবং তথা হইতে পদব্রজে তুরস্ক, পারস্য ও কান্দাহারের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এদেশে আসিয়াই তিনি লাহোর, দিল্লী ও আগরা পরিদর্শন করেন; এবং শেষোক্ত নগরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে একটী হস্তীর উপর চড়িয়া তাঁহার চির সাধ পূর্ণ করেন। পথিমধ্যে লোকের সহিত বিদ্রূপ পরিহাস করিয়া বিবাদ করিতেন। কিন্তু মোগল দিগের সুশাসন ছিল বলিয়া তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। মণ্ডু নামক স্থানে স্যার্ টমাস্ রো তাঁহার বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি সুরাটে গিয়া ইংরাজ দিগের নিকট অধিক পরিমাণে মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অবশেষে রো সাহেব ২৫ শে মার্চ্চ আজমীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ভ্রমণ-ক্লান্তি বশতঃ পূর্ব্বেই বুরহানপুরে তাঁহার জ্বর হইয়া ছিল; এবং সেই জ্বর হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে না করিতেই তিনি আজমীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুতরাং এখানে আসিয়া তাঁহার আরও জ্বর বৃদ্ধি হইল। জ্বরের প্রকোপে তিনি কয়েক দিন অজ্ঞান হইয়া শয্যাগত রহিলেন। অবশেষে কিয়দ্দিন আজমীরে বশ্রাম করিয়া সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইলে পর ১০ই জানুয়ারি তিনি সম্রাটের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বুরহানপুরে কুমার বাহাদুর পারবেজের দরবার দেখিয়া তিনি যেরূপ মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, এবার জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবার দেখিয়া তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, রজত-স্তম্ভ-বেষ্টিত সুপ্রশস্ত সভাগৃহ দীপ্তিময় হইয়া আছে। তন্মধ্যে মহামূল্য মণি-মুক্তাদি-খচিত সিংহাসন বহুমূল্য পারস্যদেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত হইয়া সভামণ্ডপ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সম্রাট সেই কারু-কার্য্য-বিশিষ্ট দ্যুতিময় সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সিংহাসনের চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত চারিটী সুবর্ণ-দণ্ডের উপর সংশ্লিষ্ট হীরকাদি-মণ্ডিত চন্দ্রাতপ চাকচক্যশালী হইয়া দোদুল্যমান হইতেছে। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে উচ্চ বেদীর উপর রাজকুমার ও উচ্চপদস্থ ওমরাহগণের বিচিত্র আসন বিন্যস্ত রহিয়াছে। সম্রাটের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত কৃপাণ ও শাণিত বর্শা হস্তে রক্ষিগণ নিঃশব্দে পদ সঞ্চরণ করিতেছে। সভাগৃহের

পার্শ্বদেশেই গোসলখানা। এই স্থানে বাদসাহ সন্ধ্যার পর বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। যাঁহারা সবিশেষ আত্মীয় ও পরিচিত, তাঁহারাই এস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতে পারিতেন। দরবার ও গোসলখানার পশ্চাদ্ভাগে বাদসাহের অন্তঃপুর। যাহারা এই স্থানে প্রহরী থাকিত, তাহারা সকলেই নপুংসক। মুসলমান ও মোগল সম্রাটগণের রাজত্ব কালে অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নপুংসক প্রহরীই নিযুক্ত থাকিত। পরিচিত ও বিশ্বস্ত স্ত্রীলোক বা নপুংসক ভিন্ন অন্য কেহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। অন্তঃপুরের অনতিদূরেই একটী সুরম্য উদ্যান ও তাহাতে কয়েকটী মনোহর ফোয়ারা ছিল। উদ্যানের ভিতর একটী রমণীয় গৃহে বাদসাহ নিদ্রা যাইতেন। এই গৃহের পূর্ব্বদিকে একটী বাতায়ন ছিল। আকবর বাদসাহ প্রত্যহ প্রত্যূষে ইহার নিকট বসিয়া সূর্য্যদেবের উদয় প্রতীক্ষা করিতেন। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন; এজন্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্থানে বসিয়াই সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।

জাহাঙ্গীর প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাতায়নের নিকট গিয়া দরবার করিতে বসিতেন। শত শত আবেদনকারী দূরদেশ হইতে আসিয়া শত শত আবেদন পত্র লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সম্রাট প্রধান মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া তৎসমুদায়ের যথাযথ বিচার করিতেন। বেলা ৯।১০ টার সময় তিনি অন্তঃপুরে গিয়া স্নান ও আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন। দুই প্রহর উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার বাতায়নের নিকট আসিয়া সিংহ ব্যাঘ্রের যুদ্ধ, মনুষ্যদিগের মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি

কৌতুক দর্শন করিতেন। ৩।৪ টার সময় দরবার গৃহে গিয়া রাজকার্য্য দেখিতেন। তাঁহার আসন ভূতল হইতে কয়েকটী অধিরোহিণীর উপর সংস্থিত ছিল। তাঁহার ওমরাহগণ সর্ব্বনিম্ন হইতে তিনটী অধিরোহিণীর উপর নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেন। দরবারের বাহিরে সাধারণ লোকে বিচার কার্য্য দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত।

দুই জন সম্ভ্রান্ত নপুংসক আসিয়া রাজদূত রো সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত দরবারে লইয়া গেল। রো সাহেব কহেন "সম্রাটের দরবারে গিয়া আমার মনে হইল, যেন আমি লণ্ডন নগরের কোন নাট্যশালায় বসিয়া আছি; এবং কোন রাজার সমক্ষে নাটকাদি অভিনীত হইতেছে"। আকবর সাহ নিয়ম করিয়া ছিলেন যে, যে কেহ হউক না কেন মোগল দরবারে বাদসাহের নিকট আসিতে হইলে ভূমির দিকে মস্তক অবনত করিয়া আসিতে হইবে। রো সাহেব প্রতীচ্যদেশীয় লোক; সুতরাং তিনি এরূপ রীতি রক্ষা করিতে কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আমার স্বদেশীয় সম্রাটের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও সম্মান প্রকাশ করি, ভারত সম্রাটের প্রতিও ঠিক সেইরূপ করি।" তিনি সম্রাটের আজ্ঞানুসারে নিম্ন হইতে তিনটী অধিরোহিণীতে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যেকটীতে আরোহণ করিবার সময় তাঁহাকে এক এক বার মস্তক নত করিয়া সেলাম করিতে হইয়া ছিল। অবশেষে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া দেখিলেন যে রাজা, আমির ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রীদিগের

নিকট তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জাহাঙ্গীর তাঁহার যথেষ্ট সম্মাননা করিয়া কহিলেন "আপনাদের দেশের রাজা আমার ভ্রাতার স্বরূপ"। রাজা জেমস্ যে পত্র খানি দূতের দ্বারা জাহাঙ্গীরকে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহা তিনি আগ্রহ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। রো সাহেব বিলাত হইতে বাদসাহের জন্য যে সকল উপহার সামগ্রী আনিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে দেড় হাজার টাকা মূল্যের এক খানি গাড়ী, কয়েক খানি ছুরি, কাঁচি ও তরবারি, গুটিকয়েক বাক্স, কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট বিলাতি ও ফরাসী মদ্য, কয়েক খানি বহুমূল্য তৈলচিত্র ও আর একটী পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্রই প্রধান। ছবি গুলির মধ্যে একখানি স্বয়ং ইংলণ্ডাধিপতি জেমস্ ও আর একখানি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতিকৃতি; এবং অন্যান্য গুলি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রূপবতী ভদ্রমহিলা দিগের চিত্রিত মূর্ত্তি।

গাড়ী খানি অত্যন্ত বড় বলিয়া দরবারে না আনিয়া বাহিরেই রাখিয়া দেওয়া হইল। জাহাঙ্গীর বাদ্যযন্ত্রটী লইয়া বাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ যন্ত্র তিনি বাজাইতে জানিতেন না বলিয়া ইহা তাঁহার শ্রুশ্রাব্য বোধ হইল না। তখন রো সাহেবের জনৈক সহচর যন্ত্রটী এরূপে বাজাইতে লাগিলেন যে, বাদসাহ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি গাড়ী খানি বাহিরে স্বয়ং দেখিতে না গিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে তাহা দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনিও তাহা দেখিয়া আসিয়া সম্রাটকে তাহার আকৃতি বুঝাইয়া দিলেন। দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে স্বয়ং সম্রাট ইহা দেখিতে বাহিরে গেলেন। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ও তাহার ভিতর

প্রবেশ করিয়া কয়েক জন ভৃত্যকে টানিতে অনুমতি দিলেন। সেই দিন তিনি সন্ধ্যাকালে কয়েক জন স্বীয় প্রধান কর্ম্মচারীকে নিমন্ত্রণ করেন। রাত্রি ১০টা বাজিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে তিনি রাজা জেম্‌সের প্রদত্ত পরিচ্ছদ ও তরবারি লইয়া একবার আপনাকে সুসজ্জিত করিবেন। তখন রো সাহেব নিজ-গৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। হঠাৎ সম্রাট-প্রেরিত লোক আসি-য়াছে শুনিয়া তিনিও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে সম্রাট তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। রো সাহেব অনেক সহচর সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন; এবং সম্রাটকে বিলাতি পোষাক পরাইয়া দিলে তিনিও এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সাহেব-প্রদত্ত উপহার দ্রব্য গুলি তাঁহার মনে লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কোনরূপ উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য মণিমুক্তা না পাইয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছিলেন। সম্রাট জানিতেন না যে,তাঁহার ভারতভূমি যেরূপ রত্ন-প্রসবিনী, পৃথিবীর আর কোন দেশ সেরূপ নহে। রো সাহেব বাণিজ্যে সুবিধা করি-বার জন্য সম্রাটের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহার সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া কেবল উপহার সামগ্রীর কথা কহিতেন। তিনি এক দিন রো সাহেবকে বলিলেন, "আপনার দেশে উত্তম ঘোটক যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে আপনি আমার জন্য ইহা আনেন নাই কেন?" রাজদূত কহিলেন "মহাশয়! বিলাত হইতে এদেশে ঘোটক আনা অসম্ভব। স্থলপথে আনিতে গেলে তুরুস্ক ও পারস্যের ভিতর দিয়া আনিতে হইবে; কিন্তু সেখানে আজ কাল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। জলপথে আনাও বড় দুষ্কর; কারণ উত্তাল

অন্তরীপের নিকটে আসিলেই ঝড় ও তুফানে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে"। তখন সম্রাট বলিলেন, "যদি ৬টী ঘোড়া সেখান হইতে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে অন্ততঃ একটী ঘোড়াও এখানে বাঁচিয়া আসিতে পারে; এবং যদি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভাল করিয়া খাওয়াইলেই ক্রমে ক্রমে পুষ্ট ও সবল হইয়া উঠিবে"। তখন রো সাহেব বাদসাহের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে একটি ঘোড়া পাঠাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর রোর প্রদত্ত মদ্য পান করিয়া এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি কহিলেন "আপনি যদি আমাকে এরূপ উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিই"।

প্রথমবারের উপহার সামগ্রী দেখিয়া জাহাঙ্গীর অত্যন্ত প্রীত হইয়া ছিলেন। এজন্য রো সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর দিগকে আরও কতকগুলি উপহার সামগ্রী পাঠাইতে বলেন। এবার কয়েক খানি উৎকৃষ্ট তৈলচিত্র ছিল। সম্রাট এক এক খানি করিয়া চিত্র গুলি দেখিতে লাগিলেন। প্রায় সমস্ত গুলি দেখিয়াই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন; কিন্তু এক খানি দেখিয়াই তিনি অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ বাদসাহের এরূপ রোষপূর্ণ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া রো সাহেব অত্যন্ত ভীত হইয়া গেলেন; এবং ইহার কারণ কি, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই চিত্র খানিতে একটী সুন্দরী রমণী একজন বিকটাকার দৈত্যের নাসিকা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল। এই সুন্দরী রমণী গ্রীস দেশীয় সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "ভিনাস"। তিনি ভিনাসের

অনুপম রূপ-লাবণ্য ও চিত্রকৌশল দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন; কিন্তু দৈত্যের কৃষ্ণবর্ণ বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে মনে মনে ভাবিলেন, ইহা আমাদেরই বিষয় লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ-মূর্ত্তি আমার, এবং ঐ শুভ্রকান্তি রমণী-মূর্ত্তি নুরমহলের। রো সাহেব সে দিনের সেই বিভ্রাট দেখিয়া সভয়চিত্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন তিনি প্রধান প্রধান ওমারাহগণের সাহায্যে বাদসাহকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন।

জন্মতিথি উপলক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি-মুক্তাদিতে তুলিত হওয়া মোগল সম্রাটদিগের কৌলিক প্রথা ছিল। আকবর বাদসাহই এই প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। রো সাহেব জাহাঙ্গীরের জন্মদিনে রাজ-ভবনে যে সকল উৎসবের কথা নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ স্থলে বিবৃত হইল। "অদ্য ১লা সেপ্টেম্বর। রাজধানী উৎসব-ময়ী। নগরের প্রত্যেক গৃহেই নৃত্য গীত হইতেছে। রাজপথ লোকাকীর্ণ ও কোলাহল-পূর্ণ। রত্নগর্ভা ভারতভূমির যাবতীয় রত্ন আজ সম্রাটকে সুসজ্জিত করিবে। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ রজত-স্তম্ভে বিরাজিত, এবং তোরণ দেশ বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্প মালায় বিভূষিত হইয়াছে। রক্তবর্ণ মোগল পতাকা প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উড্ডীয়মান হইয়া মোগল সম্রাটের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। বস্তুতঃ, রাজধানী বহুবিধ রত্ন মালায় বিভূষিত হইয়া অমরাবতীর রূপ ধারণ করিল। দীন দরিদ্রেরা আজ সকলেই হৃষ্টচিত্ত; কারণ সম্রাট তুলাদণ্ডে

তুলিত হইলে সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদি তাহাদিগের মধ্যেই বিতরিত হইবে। রাজভবনের অন্তর্গত একটী শ্যামল উদ্যানে তুলাদণ্ডের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্যানের চতুর্দ্দিকে একটী স্বচ্ছ-সলিল পরিখা। পরিখার তীরভাগে বহুবিধ সুগন্ধি-পুষ্প-প্রসবিনী লতাবলী। উদ্যানের মধ্যস্থলে সুরম্য প্রস্তর-মণ্ডিত একটী অত্যুচ্চ মঞ্চ। এই মঞ্চেরই উপর তুলা-দণ্ড ঝুলিতেছে। তুলাদণ্ডের উপর রত্ন-খচিত ও মুক্তা-মণ্ডিত উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ; এবং তাহার উপর দিগন্তব্যাপী সুনীল নভোমণ্ডল। বিশুদ্ধ সুবর্ণ স্তম্ভ একত্র সন্মিলিত করিয়া সন্ধি-স্থল হইতে তুলাদণ্ড ঝুলান হইয়াছে। তুলাদণ্ডে বসিবার স্থানটী চতুষ্কোণ; এবং স্বর্ণপত্রে আবৃত ও মহামূল্য মণি-মাণিক্যে মণ্ডিত। তুলা স্থানের অনতিদূরে দিগ্দেশাগত রাজন্যবর্গ ও প্রধান প্রধান ওমরাহগণ সুবিখ্যাত বসোরার গালিচার উপর বসিয়া সম্রাটের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্রাট সহসা তুলাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিকটবর্ত্তী রাজন্যবর্গ ও ওমরাহগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক রত্নমালায় মণ্ডিত। উষ্ণীষের উপর কপোত-ডিম্বাকার একটী বৃহৎ উজ্জ্বল মণি বিরাজ করিতেছে। হস্তে হীরকবলয় এবং কণ্ঠে মণিহার ও স্ফটিক মালা দোদুল্যমান হইতেছে। কৃপাণ-কোষে মণি-খচিত উজ্জ্বল তরবারি কটি-দেশ-বদ্ধ সুবর্ণ-শৃঙ্খলে লম্বমান রহিয়াছে। বাদসাহ উপস্থিত হইবামাত্র তুলাদণ্ডের কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি তুলাদণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া প্রথম ছয়বার রৌপ্য মুদ্রার ভারে তুলিত হইলেন, দ্বিতীয় বারে

সুবর্ণ, মণি-মুক্তা ও বহুমূল্য শিল্প-কার্য্য-সম্পন্ন ঢাকাই মসলিন ও দেশীয় কৌশেয় বস্ত্রে তিনি তুলিত হইলেন। তৃতীয় বারে আতর, চন্দন, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য, এবং ধানা, যব ও গোধূম প্রভৃতি শস্যের ওজনে তাঁহার দেহ ভার গ্রহণ করা হইল। এইরূপে অনেকবার তুলিত হইলে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী গুলি তিনি দীন দরিদ্রদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিতেন। সম্রাট তুলাদণ্ড হইতে নামিয়া আসিলেন। সম্মুখে তাঁহার জন্য নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন সামগ্রী রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি তাহা অঞ্জলিপূর্ণ লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্য ও ওমরাহদিগের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। তাঁহারাও সম্রাটের প্রসাদ কুড়াইতে ব্যস্ত হইয়া গেলেন। জন্মতিথির দিন যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তাহা সম্রাটের অন্তঃপুর হইতেই দেওয়া হইত। মোগল সম্রাটগণের মাতাদিগকে বাদসা-বেগম বলিত। তাঁহারা-সম্রাট সন্তানদিগের মঙ্গল কামনায় তুলাকার্য্যের যাবতীয় উপাদান সামগ্রী অন্তঃপুর হইতেই পাঠাইয়া দিতেন। দিল্লীর অন্তঃপুরে একটী রেশমের রজ্জু থাকিত। সম্রাটের জীবনে যত জন্মোৎসব হইত, বাদ্‌সা-বেগম প্রতিবৎসর সেই দিনে সেই রজ্জুতে একটী করিয়া গির বাঁধিয়া রাখিতেন"।

পূর্ব্বোক্ত জন্মতিথি উৎসবের পর রাজদূত রো সাহেব স্বদেশে প্রতিগমন করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাটও রাজা জেমসের জন্য স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র লিখিয়া রো সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্র লইয়া রাজদূতও স্বদেশ গমন করিলেন। পত্র খানির ভাবার্থ এই "যখন-আপনি আমার এই পত্র খানি খুলিবেন, তখন যেন আপনার

অন্তঃকরণ সুগন্ধি-পুষ্প-পূর্ণ উদ্যানের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। সকল লোকেই যেন আপনার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে, এবং সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজা অপেক্ষা যেন আপনার অধিক যশঃগৌরব হয়। সমস্ত নরপতিই যেন নির্ঝরের ন্যায় আপনার নিকট হইতে রাজনীতি শিক্ষা করেন। আপনি রাজদূত রো সাহেবের দ্বারা প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ যে সকল উপহার সামগ্রী আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি আপনার অনুগ্রহ ভাজন হইবার বিশেষ উপযুক্ত পাত্র। আপনার উপহার সামগ্রী দেখিয়া ও প্রীত হইয়া আমি একদৃষ্টিতে তাহাদিগের উপর চাহিয়া দেখিয়া ছিলাম"।

আরঙ্গজীব ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

আরঙ্গজিব সাজেহানের তৃতীয় পুত্র এবং জাহাঙ্গীরের পৌত্র। ইহাঁর মাতার নাম সুলতানা কুদসিয়া। ১৬১৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে আরঙ্গজিবের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম নাম মম্মেত। বাল্যকালেই তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন; এজন্য শাজেহান আদর করিয়া তাঁহাকে আরঙ্গজিব অর্থাৎ "সিংহাসনের আভরণ" এই নাম দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বয়ং 'আলা-থাকান্' এই উপাধিও গ্রহণ করেন। তাঁহার আরও দুইটী নাম আছে। আরঙ্গজিব সে দুইটী নামেও জন সমাজে প্রসিদ্ধ। একটী নাম মহীদ্দিন অর্থাৎ ধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা; এবং আর একটি নাম আলমগীর অর্থাৎ বিশ্ব-বিজয়ী। যে আরঙ্গজিবের নাম শুনিলে এখনও মুসলমানদের হৃৎকম্প

উপস্থিত হয়, এবং হিন্দুদের চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে, আজি একশত তিরাশি বৎসর হইল তাঁহার নিষ্পন্দ মৃতশরীর ইলোরার অধিত্যকায় নিহিত রহিয়াছে। শাজেহানের দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত সাত বৎসর বয়সের সময় আরঙ্গজিব, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা, সুজা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তাঁহাদের পিতামহ জাহাঙ্গীরের নিকট আবদ্ধ ছিলেন। শাজেহান পুনর্ব্বার পিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে ইহাঁদের জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইত। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আরঙ্গজিব পিতার নিকট আগরায় ফিরিয়া আসেন।

১৬৩৩ খৃঃ অব্দে বোঁদেলার রাজা জগৎসিংহের সহিত শাজেহানের বিরোধ উপস্থিত হয়। সে সময়ে আরঙ্গজিবের বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসরের অধিক নয়। যে শোণিত-পিপাসায় তিনি চিরকাল ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আপনার ভ্রাতৃগণকেও অব্যাহতি দেন নাই, এইখানে সেই দারুণ পশুবৃত্তির সূত্রপাত। আরঙ্গজিব, মালবের সুবা নসেরিতের সহিত বোঁদেলায় চলিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর যুদ্ধ হইল। জগৎসিংহ দেখিলেন আর রক্ষা নাই, দিন দিন সমস্ত সৈন্য ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অবশেষে তিনি অশ্বারোহণে কয়েক জন অনুচরের সহিত নর্ম্মদা পারে একটী বনের মধ্যে আসিয়া লুক্কায়িত রহিলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহারা অনেক দূর আসিয়াছিলেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই। এজন্য গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া সকলে ধূলার উপরেই শুইলেন। নিদ্রা উপস্থিত হইল। সেই বনের চারিদিকে অসভ্য লোকের বাস। তাহারা কুটীরে থাকে, মৃগয়া করিয়া বেড়ায়;

পশুচর্ম্ম পরে, বনের ফল মূল ও মত্ত মাংস খায়। বনের ভিতর ঘোড়ার ডাক শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিল। আসিয়া দেখে, গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা, ও তাহাদের পৃষ্ঠে বহুমূল্য সোণা রূপার সাজ। মাটিতেও কয়েক জন সুপুরুষ শুইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ মণি-মানিক্যে ভূষিত। নীচলোকের নীচ-প্রবৃত্তি; মনে লোভ আসিয়া জুটিল। লোভেই পাপ; তাহারা নিদ্রাবস্থাতেই জগৎসিংহ ও তাঁহার অনুচরদিগকে বিনষ্ট করিল। কিন্তু পাপের ধন ভোগে আসিল না। আরঙ্গজিব এবং নসেরিত গিয়া সেই দস্যুদিগকে বধ করিলেন। জগৎসিংহের ভাণ্ডারে স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরা মুক্তায় ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। আরঙ্গজিব সেই সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গিয়া পিতার পাদপদ্মে ধরিয়া দিলেন।

ভারতে বিজয়-ডঙ্কা বাজিল। আরঙ্গজিব যুদ্ধে পদার্পণ করিলেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অগ্রে অগ্রে পতাকা ধরিয়া চলিতেন। উজ্‌বেক এবং পারস্যেরা সে সময়ের প্রসিদ্ধ রণপণ্ডিত জাতি। আরঙ্গজিব তাঁহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিলেন। পুত্রের অসাধারণ সাহস ও রণনৈপুণ্য দেখিয়া শাজেহানের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু দারা জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী। অতএব সম্রাট্ দারাকে অতিক্রম করিয়া অন্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না, আরঙ্গজিব তাহা মনে মনে জানিতেন। তদ্ভিন্ন দারার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। তজ্জন্য আরঙ্গজিব এই স্থির করিলেন যে, বিশেষ কৌশল না করিলে তাঁহার ভাগ্যে রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। এজন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি

কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিতেন। কিন্তু দারার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নিকটে থাকিলে চক্ষুঃশূল হয়, এজন্য সামান্য একটা ছল পাইয়া পিতার অনুমতিক্রমে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলেন। এই স্থানে গোলকুণ্ডার রাজার সেনানায়ক মিরজুম্না আপনার প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া আরঙ্গজীবের সহিত মিলিত হন। তখন হাইদারাবাদ গোলকুণ্ডা রাজের অধিকারে ছিল। আরঙ্গজীব মিরজুম্নাকে সঙ্গে লইয়া হাইদারাবাদ লুঠ করিলেন। সত্বর গোলকুণ্ডা অধিকার করিতেও ইচ্ছা রহিল এবং এইবার তাঁহার চিরকালের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইবার প্রকৃত অবসর আসিল।

সম্রাট্ শাজেহান পীড়িত; তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। পাছে রাজ্যে কোন অনিষ্ট ঘটে, এজন্য দারা সম্রাটের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্রাট্ হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমর-সজ্জা করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আরঙ্গজীব সাতিশয় ক্রূর; বাল্য কাল হইতেই বাহিরে কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকিতেন। এই গোলযোগের সময় তিনি প্রশান্ত-ভাবে স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য বিবিধ উপায় দেখিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তখন গুজরাটের শাসন-কর্ত্তা। আরঙ্গজীব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ভাই! পিতার ত মৃত্যুকাল উপস্থিত। আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই অলস, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও বিলাসী। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে রাখিতে তাঁহারা অযোগ্য। আমার নিজের কথা

তোমার কিছুই অবিদিত নাই। কি করি, পরমগুরু পিতার অনুরোধ, তাই বিষয় কর্ম্ম দেখিতেছি; নতুবা সংসারে তিলার্দ্ধকাল থাকিবার স্পৃহা নাই। যাহা হউক, এখন সদ্যুক্তি এই যে, তোমার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আমি মক্কা যাই। এখন আইস আমাদের উভয়ের সৈন্য লইয়া আগ-রায় যাই"।

খলের কুচক্রে দেবতারাও পড়িয়া যান, মানুষের ত কথাই নাই। আরঙ্গজীবের কুহকবাক্যে মুরাদের মন ভুলিয়া গেল। তিনি নর্ম্মদাতীরে আসিয়া আরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শাজেহানের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, এখন পীড়ার প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। দারা নির্ব্বি-বাদে পিতাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সুজা প্রভৃ-তির সে কথা বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন, লোকে যে আরোগ্যের সংবাদ রটাইতেছে, তাহা অমূলক। ইহার ভিতরে দারার নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে। সুতরাং যুদ্ধ করাই তাঁহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হইল।

দারা পূর্ব্বেই সুজার দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়া ছিলেন। এজন্য তিনি স্বীয় পুত্র সলিমান ও রাজা জয়সিংহকে প্রয়াগের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদ ঘটে, সম্রাটের এরূপ ইচ্ছা নয়। এজন্য শাজেহান গোপনে জয়সিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সুজাকে বুঝাইয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন, কারণ বিরোধে প্রয়োজন নাই। সলিমান ও জয়সিংহ কাশীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অপরপারে সুজা রহিয়াছেন। সম্রাটের আজ্ঞানুসারে জয়সিংহ তাঁহাকে

অনেক বুঝাইলেন। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ হইলে রাজ্যেরও অনিষ্ট ঘটিবে, সুজা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালায় ফিরিয়া যাইতেন; কিন্তু সলিমান সহজে ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি প্রত্যুষে সৈন্য সাজাইয়া গঙ্গা পার হইলেন। সুজা তখনও নিদ্রিত। সলিমান নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার তাম্বু আক্রমণ করিলেন। সুজা জাগরিত হইয়া অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; অবশেষে পরাস্ত হইয়া মুঙ্গেরে পলায়ন করেন।

এদিকে উজ্জয়িনী নগরে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন। তিনি সম্রাটের সেনানায়ক। আরঙ্গজীব ও মুরাদের গতি রোধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। নর্ম্মদার অপরপারে যুবরাজ আরঙ্গজীব। মুরাদ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, সেই প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। উভয় সৈন্য মিলিত হইল, তুমুল যুদ্ধ হইল; যশোবন্ত পরাস্ত হইলেন। তাহার পর স্বয়ং দারাও কনিষ্ঠদিগকে শাস্তি দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাস্ত হইয়া পলাইয়া যান।

যশোবন্ত মনের ঘৃণায় আপনার রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন; সম্রাটের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু গৃহে নারী-গঞ্জনা, তাহার অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল। মহারাজ রাজধানীর নিকট আসিলেই রাণী দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনি গর্ব্বিত ভর্ৎসনায় বলিতে লাগিলেন,— "আমরা বীরকন্যা, বীরপুরুষকেই বরণ করি, এবং বীরপুরুষের গলায় বরমাল্য দিই। কাপুরুষকে বিবাহ করা রাণাকুলকন্যাদের অভ্যাস নাই। রাজপুত্রদিগের প্রাণের অপেক্ষা মানের গৌরব

অধিক। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া নূতন কথা নয়; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসা রাজপুত বংশের মধ্যে তোমার নিকট আজি নূতন দেখিতেছি। বোধ হয় তুমি আমার সে পতি নও, কোন প্রতারক,—ছল করিয়া দ্বারের কাছে ডাকিতেছ। আমার যিনি পতি, আজি তিনি সমরক্ষেত্রে বীরশয্যায় শুইয়া আছেন। দুর্ম্মতি! দ্বার ছাড়িয়া দে, আমি চিতা সাজাইয়া পতির অনুগমন করিব।" মনস্বিনী রাজপুত-রমণীদিগের তেজস্বিতা ধন্য। বীরত্বের এত আদর! যুদ্ধের নাম শুনিলে তাঁহাদের শিরায় শিরায় তপ্ত-শোণিত-স্রোতঃ ছুটিয়া বেড়াইত।

আরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা এক প্রকার নিরস্ত হইলেন। জয়সিংহ প্রভৃতি যে সকল মহাবীর দারার প্রধান সেনাপতি, আরঙ্গজীব পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়া এবং চর পাঠাইয়া তাঁহাদের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেনাপতিরাও ভাবিলেন, দারার আর মঙ্গল নাই। শাজেহানেরও দিন ফুরাইয়াছে; বুঝিতে গেলে এই বিশাল রাজ্য আরঙ্গজীবের করায়ত্ত। ইহা দেখিয়াই প্রধান প্রধান সেনাপতি দারার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন।

এখন সিংহাসনের প্রধান কণ্টক স্বয়ং সম্রাট্। মুরাদ আর এক জন প্রতিযোগী। এই দুই জনকে নিরস্ত করিতে পারিলেই মনোরথ পূর্ণ হয়। শঠের অসাধ্য কিছুই নাই। আরঙ্গজীব বুঝিয়া দেখিলেন, এখনও বল প্রকাশের সময় আইসে নাই; তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য শঠতাই একমাত্র উপায়। এজন্য মুরাদকে সঙ্গে লইয়া তিনি আগরার নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আরঙ্গজীব এক

জন বিশ্বস্ত চর দ্বারা সম্রাটকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা সন্তানের অযোগ্য। কিন্তু তাহাতে আমার কোন দোষ নাই, দোষ কেবল দারার। যাহা হউক, তিনি যে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহাই মঙ্গল। এখন পুত্র বলিয়া এ দাসকে ক্ষমা করিলে আমার হৃদয় শীতল ও সুস্থির হয়।"

চর আসিয়া সম্রাটকে আরঙ্গজীবের নিবেদন জানাইল। বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি যায়; যাহা হউক, তবু পিতা,—শাজেহান নিজ পুত্রকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। অবসর পাইলেই মোগল-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইতে হইবে, বহুকাল হইতেই আরঙ্গজীবের ইচ্ছা। অন্যে না বুঝিতে পারে,শাজেহান সে দুরভিসন্ধি অনেক দিন হইতে বুঝিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু ভিতরের কথাটা কি, তাহা ঠিক জানিবার জন্য আপনার কন্যা জাহানারাকে পুত্র-দিগের তাম্বুতে পাঠাইয়া দিলেন।

জাহানারা প্রথমে মুরাদের তাম্বুতে গেলেন। গত যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি কাতর হইয়া শুইয়া ছিলেন। এমন সময়ে জাহানারা উপস্থিত। মুরাদ জানিতেন, জাহানারার সম্পূর্ণ স্নেহ দারার প্রতি। সে কারণ তিনি তাহার কিছুই সমাদর করিলেন না; বরং অনেক কটু কথা বলিয়া ভগিনীর অবমাননা করিলেন। চর গিয়া আরঙ্গ জীবকে গোপনে এই সকল বৃত্তান্ত জানাইল।

কুচক্রই আরঙ্গজীবের সকল কার্য্যের মূলমন্ত্র। জাহানারা ক্রোধ করিয়া উঠিয়া যাইতেছেন শুনিয়া আরঙ্গজীব দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিলেন। খলের হৃদয়ে বিষ, মুখে মধু; তিনি

জাহানারার হস্তে ধরিয়া বলিলেন,—"ভগিনি! সে কি! আমি কি কেহই নই? যদি আসিয়াছ, ভাই বলিয়া একবার ত তত্ত্ব লইতে হয়। এত দিন বিদেশে ছিলাম বলিয়া কি ভুলিয়া গিয়াছ? পিতা এত পীড়িত হইয়াছিলেন, লোক পাঠাইয়াও ত সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল"। এইরূপ তোষামোদ করিয়া তিনি জাহানারাকে আপনার তাম্বুতে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"ভগিনি! বলিব কি লোকের ব্যবহার দেখিয়া সংসারে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। তুমি পিতার নিকট আমার এই সানুনয় নিবেদন জানাইবে; আমি একবার তাঁহার শ্রী-পাদ-পদ্ম দর্শন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিব। অতএব আর বিলম্বে কাজ নাই, পরশ্ব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

জাহানারা চলিয়া গেলে আরঙ্গজীব পিতাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় রহিলেন। শাজেহানও বুঝিতে পারিলেন যে, শঠের এত ভক্তি সুলক্ষণ নয়। তিনি দারাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"দুই দিন পরে আরঙ্গজীব আমার নিকট আসিয়া শরণ লইবে। মুরাদের প্রতি সে বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, খলকে বিশ্বাস নাই। তুমি সৈন্য সামন্ত লইয়া শীঘ্র আগরায় আসিবে। এখন আরঙ্গজীবকে বন্দী করাই কর্ত্তব্য"।

দারা তখন দিল্লীতে ছিলেন। সম্রাট্ রাত্রি দুই প্রহরের সময় নহিরিদ্দিল নামক জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বিদায় করিলেন। সেই খানে শায়াস্তা খাঁর জনৈক গুপ্ত চর উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি আসিয়া পত্রের কথা ব্যক্ত করিয়া

দিল; কিন্তু পত্রে কি লেখা রহিয়াছে, তাহা বলিতে পারিল না। ইতি পূর্ব্বে সম্রাট্, শায়াস্তা খাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। সেই কারণে তিনি কয়েক জন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া গোপনে নহিরিদ্দিলকে ধরিয়া আনাইলেন। পত্র পড়িয়া দেখেন তাহাতে আরঙ্গজীবের কথা। তৎক্ষণাৎ তাঁহার তাম্বুতে গিয়া পত্র খানি দিলেন। আরঙ্গজীব স্থিরচিত্তে আদ্যন্ত পড়িলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। কেবল নহিরিদ্দিলকে একটী গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন।

সাক্ষাৎ করিবার দিন উপস্থিত হইল। সসৈন্যে দারা আসিয়া পৌঁছিবেন,—কিন্তু তিনি আসিলেন না। আরঙ্গজীবও সাক্ষাৎ করিতে না গিয়া এই বলিয়া সম্রাটকে এক খানি পত্র লিখিলেন,—"আপনি জানেন, আমি অপরাধী। অপরাধীর মনে সর্ব্বদাই ভয় ও সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। সে জন্য সহসা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার আশঙ্কা হইতেছে। অতএব প্রথমে কতকগুলি দেহরক্ষকের সহিত আপনার নিকটে আমার পুত্র মহ্মদকে পাঠাইব। মহ্মদ যদি সে খানে গিয়া এমন কথা আমাকে বলিয়া পাঠায় যে, দুর্গের ভিতর অস্ত্রধারী সৈন্য কেহই নাই, তবে আমি আপনার নিকটে যাইতে সাহস করিতে পারি"।

পত্র পাইয়া শাজেহান অনেকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে আরঙ্গজীবের প্রস্তাবেই সম্মত হইালন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে বন্দী করা চাই। সেজন্য দুর্গের স্থানে স্থানে কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া রাখিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্তঃপুরে তাতার দেশীয় অনেক পরিচারিকা ছিল। তাহারা

বীর মহিলা। সম্রাট্ তাহাদিগকেও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাজাইয়া রাখিলেন।

এদিকে আরঙ্গজীব,পুত্রকে কথা শিখাইয়া শাজেহানের নিকট পাঠাইলেন। মহম্মদ দুর্গে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া আসিলেন, কোথাও কেহ নাই। অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে অনেক অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া আছে। তিনি সম্রাটকে স্পষ্টই বলিলেন,—"এই সকল লোক দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। ইহারা দুর্গে থাকিলে পিতা এখানে আসিবেন না"। শাজেহানের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল,তিনি তাহাদিগকেও বাহির করিয়া দিলেন। মহম্মদ দেখিলেন চারিদিক পরিষ্কার হইয়াছে। এখন দুর্গের ভিতরে সম্রাটের অপেক্ষা নিজের লোকই অধিক।

আরঙ্গজীবের নিকট এই সংবাদ গেল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া বলিল যে, যুবরাজ প্রস্তুত হইয়াছেন, এখনিই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলেন। আরঙ্গজীব, আপনার দেহরক্ষক ও পারিষদদিগকে লইয়া অশ্বারোহণে একবারে দুর্গের দিকে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আক্‌বরের কবরের দিকে চলিয়া গেলেন। শাজেহান এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে মহম্মদকে বলিলেন,—"তোমার পিতা যদি এখানে আসিবে না,তবে তুমি কি করিতে এখানে আসিয়াছ?" মহম্মদ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমি রাজকার্য্যের ভার বুঝিয়া লইতে আসিয়াছি। আমাকে ভাণ্ডারের চাবি দিউন"। সম্রাট্ তখন আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছেন, আর উপায় নাই। কাজেই মহম্মদের হস্তে সমস্ত চাবি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া আরঙ্গজীব মুরাদকে কহিলেন,—"ভাই! এত দিনে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। আজি হইতে তুমি দিল্লীর সম্রাট্। এখন আমার একটী ভিক্ষা আছে, তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দাও। মক্কায় গিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করি"। মুরাদ সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

আরঙ্গজীবের বাহিরে এই রূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা, কিন্তু অন্তঃকরণে হলাহল; তিনি মনে মনে মুরাদের প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিবেন। ইতি মধ্যে সংবাদ আসিল যে, দিল্লীতে অনেক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। শীঘ্র আগরায় আসিয়া তিনি শাজেহানকে মুক্ত করিবেন। আরঙ্গজীব তৎক্ষণাৎ মুরাদকে লইয়া দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন। দুই জনে মথুরায় উপস্থিত। এই খানে মুরাদের পারিষদেরা কহিলেন,—"আপনি কদাচ আরঙ্গজীবের সহিত থাকিবেন না। তিনি আপনার প্রাণবিনা-শের চেষ্টায় রহিয়াছেন। আমাদের পরামর্শ এই, আপনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিনষ্ট করুন। নতুবা আর নিস্কৃতি নাই"!

আরঙ্গজীবকে বধ করিতে হইবে, এই রূপ যুক্তি স্থির হইল। মুরাদ জ্যেষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এখানে পার্শ্বের তাম্বুতে কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক লুকাইয়া থাকিল, ইঙ্গিত পাইলেই তাহারা আসিয়া আরঙ্গজীবের মস্তকচ্ছেদন করিবে। মুরাদ স্বভাবতঃ অকপট ও উদার-স্বভাব। শত্রুমিত্র সকলের প্রতিই তাঁহার সমান ব্যবহার। তাই আরঙ্গজীব নিঃশঙ্কচিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে নাজির শবাস নামক জনৈক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া মুরাদের কাণে কাণে কি বলিল। শঠতার

আরঙ্গজীব পরাস্ত হইবার নহেন। উভয়ের আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি কাতর হইয়া মুরাদকে বলিলেন,—"ভাই! আজি আমোদ করা হইল না। আমার পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরিয়াছে। তুমি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, আমি আবার কল্য আসিব"। এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে তাম্বুর বাহিরে আপনার দেহরক্ষকদিগের নিকট উঠিয়া গেলেন।

আরঙ্গজীব ছলনা করিয়া তিন চারি দিন শয্যাগত থাকিলেন। উদরবেদনার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মুরাদের সরল মন; তিনি বুঝিলেন, সত্যই পীড়া হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোন প্রকার চাতুরী নাই। তিন চারি দিনে পীড়া কমিয়া গেল। আরঙ্গজীব মুরাদকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"ভাই! সে দিনের তত উদ্যোগে আমি বড় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছি। সে জন্য আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, অদ্য আমার তাম্বুতে তোমার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে বিপদে পড়িতে হইবে, এ কথা মুরাদের পারিষদেরা অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ মানিলেন না। দেহরক্ষকেরা বাহিরে থাকিল; তিনি চারি জন প্রধান সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া আরঙ্গজীবের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। নৃত্য গীত ও মদ্যপান চলিতে লাগিল। মুরাদ ও তাঁহার পারিষদেরা মদে হতচৈতন্য; যাবতীয় দেহ-রক্ষক মদের নেশায় ঢুলিয়া পড়িয়াছে। এই সুযোগে আরঙ্গজীব আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বাঁধিয়া আগরায় পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, আগরায় পৌঁছিলে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল।

আরঙ্গজীব দেখিলেন, এখন সিংহাসন অধিকার না করিলে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে মানিবে না; নানা লোকে নানা কথা কহিবে। পারিষদেরাও বুঝিলেন যে, আরঙ্গজীব দিবা-রাত্র যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, তাহা ছলমাত্র। পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে রাজ্যে বঞ্চিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব মনের কথা বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে যথাবিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আরঙ্গজীব সংসার-বিরাগীর ন্যায় বলিলেন,—"দেখিতেছি, তোমাদের নিজের সুখের জন্য তোমরা আমাকে সংসার ত্যাগ করিতে দিলে না। ভাল, না দাও; সন্ন্যাসীরা নির্জ্জন গিরিগুহায় বসিয়া যেরূপ শান্তিসুখ লাভ করেন, ঈশ্বর করুন, এই রত্ন-সিংহা-সনে বসিয়া আমিও যেন সেইরূপ সুখ ভোগ করি। রাজ-কার্য্য দেখিতে হইলে ঈশ্বরচিন্তা করিতে আমি অবসর পাইব না, তাহা সত্য। কিন্তু কাজ লইয়া কথা। দিল্লীর অধী-শ্বর হইলে আমি ভূরি ভূরি সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই"। লোককে এইরূপ বুঝাইয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ২ আগষ্ট দিল্লীর নিকটবর্ত্তী আজাবাদের উদ্যানে আরঙ্গজীব যথাবিধানে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

আরঙ্গজীব সম্রাট্ হইয়াছেন, বাঙ্গলায় সংবাদ পৌঁছিল। শা সুজা পুনর্ব্বার সমর সজ্জা করিয়া প্রয়াগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আরঙ্গজীবও সসৈন্যে তাঁহার গতিরোধ করিতে গেলেন। কিদ্বা গ্রামে দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। সে দিনের যুদ্ধে শা সুজা একটু সুস্থির থাকিতে পারিলেই

সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহারই কপালে বিজয়পত্র পরাইয়া দিতেন। আরঙ্গজীব যে হস্তীতে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন, অস্ত্রাঘাতে তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। সুজার হস্তীও আহত হয়। দুই জনেই আপন আপন হস্তী হইতে নামিয়া অন্য হস্তীতে চড়িবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন। মিরজুম্লা, আরঙ্গজীবকে কহিলেন, "প্রভু! এখন হস্তী হইতে নামিলে আপনার রাজ্য গেল জানিবেন'। আরঙ্গজীব নামিলেন না। কিন্তু সুজা আপনার হস্তী পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের উপর গিয়া চড়িলেন। কাজেই তাঁহার সৈন্যেরা প্রভুকে আর দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইয়া গেল।

সুজা বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ ও উজির মিরজুম্লা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বাঙ্গালা হইতেও তাঁহাকে দূরীভূত করিলেন। ভারতে পলাইবার আর স্থান নাই; যে দিকে যাইবেন, সেই খানেই আরঙ্গজীবের বিজয় পতাকা উড়িতেছে। অবশেষে তিনি অনেক ভাবিয়া আরাকানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত বহুমূল্য রত্ন এবং প্রায় দেড় হাজার লোক ছিল। কিন্তু আরাকানের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। দেড় হাজার লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই মরিয়া গেল। কেবল শা-সুজা স্বয়ং, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী, দুইটী পুত্র, তিনটী কন্যা এবং চল্লিশ জন অনুচর জীবিত থাকিলেন। বিধাতা বিমুখ হইলে চারিদিকে বিপদ্ ঘটে। আরাকানের রাজা আরঙ্গজীবের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত ছিলেন। সঙ্গে বহুমূল্য হীরা মুক্তা ছিল, তাহাও কাড়িয়া লইতে লোভ জন্মিল। তজ্জন্য তিনি নানা প্রকার ছল করিয়া

আশ্রিত রাজপুত্রকে আপনার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। স্নুজা আপনার পরিবারবর্গ ও অনুচরগণকে সঙ্গে লইয়া একটী পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম। দুই পার্শ্বে শৈলমালা; নিম্নদেশে বেগবতী স্রোতস্বতী কুলুকুলুস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। এই দুর্গম স্থানে আরাকানরাজের সৈন্যেরা আসিয়া স্নুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পর্ব্বতের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শা-স্নুজা অনেকক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; শেষে একটা বড় পাথরের আঘাতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। রাজ-সেনারা তাঁহাকে ও তাঁহার দুই জন অনুচরকে একটী ডোঙ্গার উপরি তুলিয়া নদীর মধ্যস্থলে ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা সেই প্রবল স্রোতে সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে পারিলেন না; দুই একবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

তাহার পর সৈন্যেরা, স্নুজার অন্যান্য অনুচরদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার স্ত্রী, তিনটী কন্যা এবং দুইটী পুত্রকে রাজার নিকটে আনিয়া দিল। রাজা স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু হতভাগ্য বালক দুইটীর প্রাণ বিনষ্ট করা হইল। স্নুজার পত্নী স্নুলতানা পেয়ারা বাণা পরমস্নুন্দরী। তিনি তৎকালে রমণীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। তৈমুর-কুল-বধূর এবং তৈমুর-কুল-কন্যার চরিত্রে কলঙ্ক পড়িবে, তদপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। কিন্তু শত্রুকে মারিয়া না মরিতে পারিলে সেরূপ মরণে গৌরব কি? তজ্জন্য পেয়ারা বাণা বস্ত্রের ভিতর একখানি ছুরী লুকাইয়া রাখিলেন। পিশাচ-বৃত্তি রাজা গৃহে

প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু দাসীরা কি রূপে জানিতে পারিয়া ছুরী খানি কাড়িয়া লইল। তখন আর অন্য উপায় নাই; সুতরাং তিনি নখাঘাতে আপনার মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্য কমিয়া গেল। তাহার পর একখানি পাথরে মাথা ঠুকিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সুজার দুই কন্যা বিষ খাইয়া মরিল। অবশিষ্ট আর একটী কন্যাও অধিক দিন জীবিত ছিল না।

সুজার দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া আরঙ্গজীব পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে একদিনেরও জন্য সুখ জন্মে নাই। শাজেহান বৃদ্ধদশায় আট বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন। পাছে তাঁহার অনুগত সৈন্যেরা কখনও বিপদ্ ঘটায়, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এদিকে দারা এখনও জীবিত আছেন; তাঁহার পুত্র সলিমান শ্রীনগরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। অবসর পাইলে তাঁহারাও বিপদ্ ঘটাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন পিতাকে কারারুদ্ধ রাখিয়া রাজ্যলাভের যে সহজ কৌশল তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিজ পুত্রেরাও যে সেই কৌশল শিখিয়া লয় নাই, তাহাই বা বিচিত্র কি? রাজাদিগের মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ। ক্ষমতাবান্ লোক তাঁহাদিগের চক্ষুঃশূল। আপনার ছায়া দেখিলেও রাজাদিগের মন ঈর্ষায় শিহরিয়া উঠে। সুতরাং সকল আশঙ্কা হইতে নিরুদ্বেগ হইবার জন্য তিনি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মহম্মদের একটী অপরাধও হইয়াছিল। বাঙ্গালায় যুদ্ধের সময়ে তিনি শা-সুজার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। সুতরাং

পিতৃপক্ষ ছাড়িয়া তাঁহাকে দিনকয়েক শ্বশুরের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আরঙ্গজীব সবিশেষ কৌশল করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেন।

দারা, লাহোরে ও আজমীরে কয়েকবার যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু আরঙ্গজীবের নিকট পরাস্ত হন। পরিশেষে তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ভাবিলেন যে, এরূপ দুঃসময়ে পারস্থে গিয়া আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়ঃ। তজ্জন্য তিনি অনুচরগণের সহিত পারস্যাভিমুখে চলিলেন। সিন্ধুপারে তত্তার নিকট আসিয়া তাঁহার পত্নী সুলতানা নাদিরা বাণা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তত্তার সর্দ্দারের নাম জাইহন খাঁ। পূর্ব্বে তিনি দুইবার খুনী মকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির নিকট তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ হয়। তজ্জন্য সম্রাট শাজেহান তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। কিন্তু কেবল দারার অনুরোধে জাইহন খাঁ দুই বারই অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এজন্য দারা ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ বিপত্তিকালে তাঁহার উপকৃত সুহৃৎ অবশ্যই দুই চারি দিনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারেন। জাইহনও আশ্রয় দিলেন। কিন্তু এইখানেই সুলতানা নাদিরা বাণার মৃত্যু হয়।

দারা স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া আছেন, ইতিমধ্যে শুনিলেন যে আরঙ্গজীবের সেনানায়ক খাঁ-জেহান মুলতান হইতে তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। দারা ব্যস্ত হইয়া জাইহনের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তত্তানগর ছাড়িয়া অর্দ্ধ ক্রোশ পথ গিয়াছেন, এরূপ সময়ে দেখেন যে পশ্চাতে জাইহন, এবং সঙ্গে প্রায় এক সহস্র অশ্বারোহী। দারা স্থির করিলেন,—আমার সহিত অধিক

সৈন্য নাই। যাহারা আছে, তাহারাও পীড়া ও পথিশ্রমে কাতর। এই কারণেই জাইহন আমাকে পারস্য পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার জন্য সঙ্গে আসিতেছেন।

কিন্তু জাইহনের সেরূপ ধর্ম্ম নহে। উপকার পাইলে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, গুরুর নিকট তিনি সে পাঠ লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অর্থের গৌরব অধিক বুঝিতেন। দারাকে ধরিয়া দিতে পারিলে আরঙ্গজীবের নিকট পুরস্কার পাইব, এই লোভেই তিনি দারা ও তাঁহার মধ্যম পুত্রকে ধরিয়া খাঁ-জেহানের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এখন দারার অবস্থা বড় শোচনীয়। অঙ্গে ছিন্ন বস্ত্র; মস্তকে মলিন পাগড়ী। তাঁহার পুত্রেরও অবস্থা সেই রূপ। খাঁ-জেহান তাঁহাদিগকে একটী হস্তীর উপরি চড়াইয়া দিল্লীতে আনিলেন। দারার দুরবস্থা দেখিয়া নগরের পশুপক্ষীরাও কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু আরঙ্গজীবের হৃদয় ব্যথিত হইলনা। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্দ্দশা প্রজাবর্গকে দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে এক-বার নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া একটী নির্জ্জন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দারা জানিয়াছিলেন, মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি পূর্ব্ব হইতে বস্ত্রের ভিতরে একখানি ছুরী, একটী কলম, দোয়াত ও কয়েকখানি কাগজ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কারাগারে কলম কাটিতেন, আর বসিয়া বসিয়া দুঃখের কবিতা লিখিতেন। যখন শোকের বেগ উথলিয়া উঠিত, এক একবার পুত্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন।

আরঙ্গজীবের দরবার বসিল। দারা জ্যেষ্ঠ, তাড়াতাড়ি রাজা হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড করা কর্ত্তব্য? অনেকেই

বলিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আরঙ্গজীবের সেরূপ অভিপ্রায় নয়,ইহা বুঝিতে পারিয়া দুই এক জন সভাসদ কহিলেন,—"দারা নাস্তিক। নাস্তিকের প্রাণবধ না করিলে মন্মদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়"। এখন কথাটা ঠিক মনের মত হইল। আরঙ্গজীব কহিলেন,—সে কথা ঠিক। দারা আমার যে ক্ষতি করিতে হয়, করুক; আমি তাহা সহ্য করিতে পারি। কিন্তু নাস্তিকতা অসহ্য"। এজন্য সেই রাত্রিতেই তিনি দারার প্রাণ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নাজির ও সিফ নামক দুই জন আফগান সর্দ্দারের উপর ভার অর্পণ করিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর। দারার গৃহের পার্শ্বে হঠাৎ অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। হতভাগ্য রাজকুমারের শোকের রাত্রি কতক জাগরণে গিয়াছে,কতক বা কাকনিদ্রায় যাইবে; চক্ষুঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে,—এমন সময়ে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ কর্ণে আসিল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন; বুঝিলেন, আজি অন্তিমকাল উপস্থিত। পুত্র ঘুমাইতে ছিল, তাঁহাকে জাগাইলেন। ঘাতকেরা দ্বার খুলিল। দারা কমলকাটা ছুরী খানি লইয়া ঘরের একটী কোণে দাঁড়াইলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা দারার পুত্রকে পার্শ্ববর্ত্তী একটী গৃহে বাঁধিয়া রাখিল। প্রথমে তাহারা মনে করিয়াছিল, গলা টিপিয়া দারার প্রাণ নষ্ট করিবে। কিন্তু এরূপে প্রাণদণ্ড করা রাজপুত্রের পক্ষে ঘৃণাকর। এজন্য দারা অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া জনৈক ঘাতকের বক্ষঃদেশে আপনার ছুরী বিঁধিয়া দিলেন। অগত্যা তাহারা তরবারি দিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। দারার পুত্র সমস্ত রাত্রি পিতার রুধিরাক্ত মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নাজির ছিন্ন মুণ্ডটী লইয়া চলিয়া আসিল।

সে দিবস সমস্ত রাত্রি আরঙ্গজীবের নিদ্রা হয় নাই। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার মৃতমুখ দেখিবেন, তবে তাঁহার স্বস্তি হইবে। প্রাতঃকাল না হইতেই নাজির তাঁহার ছিন্ন মস্তক আনিয়া দিল; রক্তমণ্ডিত, বিশ্রী, বিবর্ণ,— সম্রাট দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিয়ৎ কাল জলে ভিজাইয়া আপনার হস্তের রুমালে রক্ত মুছিয়া ফেলিলেন। তখন বেশ চিনিতে পারা গেল। আরঙ্গজীব বলিলেন, —"হাঁ, এই আমার হুরদৃষ্ট দারা ভাই"। এই কথা বলিতে বলিতে পাষাণ ফাটিয়া তুই এক বিন্দু জল পড়িল। ইহার পরে সলিমান ও দারার মধ্যম পুত্রকে গোয়ালিয়রের তুর্গে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। আরঙ্গজীবের মধ্যম পুত্র মহম্মদ মৌজিম দক্ষিণ অঞ্চলে ছিলেন। কি জানি, পাছে তিনি কোন বিপদ্ ঘটান, তজ্জন্য তাঁহাকেও আপনার নিকট আনিয়া রাখিলেন।

আরঙ্গজীবের সহিত শিবজীর বিদ্রোহ মোগল ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। কুটবুদ্ধি ও তুর্নীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজীব যে মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণোন্নতি দেখাইয়া ছিলেন, অনন্ত অধ্যবসায় ও অতুল সাহস প্রকাশ করিয়া শিবজী অনেকাংশে তাহার অধঃপতন করিয়া যান। আরঙ্গজীব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই শিবজীর উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া সায়স্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করিয়া পাঠাইয়া দেন। সায়স্তা খাঁ শিবজীর উদ্দেশে পুনর্ব্বার তুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এক দিন তিনি তুর্গমধ্যে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন, এমন সময়ে শিবজী সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার তিনটী অঙ্গুলি কাটিয়া দেন। দাক্ষিণাত্যে সায়স্তা খাঁর বিপদ শুনিয়া

আরঙ্গজীব অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে আবার তিনি শুনিতে পাইলেন শিবজী স্থরাটে মোগল দিগের বন্দরে ভয়ঙ্কর উপদ্রব করিতেছে। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া শিবজীর সহিত বন্ধুতা করাই সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্রাট শিবজীর সন্তোষ সাধনের জন্য দরবারে বসিয়া তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এবং শিবজীকে দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিবার জন্য জয়পুরের রাজাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শিবজী সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে অযথোচিত স্থানে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনাঃ হইয়া ও ভিক্ষুকের বেশে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে পুনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আরঙ্গজীবের রাজ্যলাভের কৌশল এই! ইহাতে নিষ্ঠুরতা ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার কিছুই পরিচয় নাই। পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং প্রভু ভৃত্যে কাজ। যখনি অবিশ্বাস, তখনি আবার একটু কাঁদিলেই বিশ্বাস স্নেহ ও মমতা আসিয়া পড়ে। এরূপ স্থলে যে অধিকতর পাষণ্ড তাহারই জয় হইয়া থাকে।

কুকর্ম্মান্বিত লোকেরা আপনাদের কলঙ্ক ঢাকিবার নিমিত্ত এক একটী সৎকর্ম্মও করে। আরঙ্গজীবও এই কৌশল বিলক্ষণ বুঝিতেন। একবার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া প্রজাগণের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করা আমাদিগের দেশে রাজ-পুত্রদিগের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। তাঁহাদিগের বাল্যকাল প্রায় আহ্লাদ আমোদেই কাটিয়া যায়। কিন্তু আরঙ্গজীব

বিদ্যাভ্যাসে কখন আলস্য করেন নাই। আরবী এবং পারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের নানা স্থানের ভাষায় তিনি কথা কহিতে ও পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। সর্ব্বত্র বিদ্যালোচনার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত তিনি অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় থাকিলে হয় না, তত্ত্বাবধান না থাকিলে বিদ্যালয় স্থাপন করা নিষ্ফল। সেজন্য তিনি অনেকগুলি চতুর ও কৃতবিদ্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিলাসী ও অপব্যয়ী ছিলেন। কিন্তু আরঙ্গজীবের এ সকল দোষ ছিল না। তিনি সচরাচর সামান্য পরিচ্ছদ পরিয়া থাকিতেন। বিবাহ প্রভৃতি সমারোহ কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে কখনও তাঁহার অর্থ নষ্ট হয় নাই। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পথিকদিগের নিমিত্ত আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল আশ্রমে খাদ্য সামগ্রীও সঞ্চিত থাকিত। প্রজামাত্রেই সম্রাটের নিকট যাইতে পারিত। বিচারালয়ে কাহারও প্রতি অন্যায় হইলে সে স্বয়ং সম্রাটকে তাহা অনায়াসে জানাইত। সুতরাং বিচারপতিরা ইচ্ছা করিলেই উৎকোচ লইতে পারিতেন না।

সম্রাট্ দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু বিলক্ষণ মিষ্টভাসী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান আহ্নিক করিতেন। তাহার পর বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য দেখিতেন। একপ্রহরের পর ভোজনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভোজনান্তে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও অশ্বাদি পশুর ক্রীড়াযুদ্ধ দেখিতেন। ইহাই তাঁহার আমোদ আহ্লাদ ছিল।

আমোদ আহ্লাদের পর তিনি দেওয়ান-ই-আম গৃহে সভা করিয়া বসিতেন। এই সময়ে আমীর ওমরাহ ও বিদেশীয় রাজদূত প্রভৃতি সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শুক্র-বারে দরবার বন্ধ থাকিত। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে যেমন রবি-বার, মুসলমানদিগের পক্ষেও শুক্রবার তদ্রূপ। তাই সম্রাট এই দিন বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন না। অন্যান্য মুসলমান সম্রাটদিগের অন্তঃপুর অসংখ্য রূপবতী মহিলায় পরিপূর্ণ থাকিত। আরঙ্গজীবেরও অন্তঃপুরে অনেক রমণী ছিল, কিন্তু সে সকল কেবল রাজবাড়ীর শোভার জন্য; ফলতঃ বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন তিনি কখন অন্য নারীর মুখ দেখিতেন না।

অতএব আরঙ্গজীবের গুণরাশি দোষরাশির ঠিক বিপরীত। এক দিকে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না-সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার। তাঁহারই রাজত্বকালে বাবরের বহুশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ও আকবরের বহুযত্নে পরিপুষ্ট মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণোন্নতি ও ক্ষয়-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁহার দুশ্চরিত্রতাই মোগল সাম্রাজ্য-পতনের প্রধান কারণ। প্রজা সন্তুষ্ট না থাকিলে রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। তখন কুটিল রাজনীতি ও অস্ত্রবল মিথ্যা। আরঙ্গজীব আপনার শঠতা ঢাকিবার জন্য সকলকে ভাল বাসিতেন; এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক তাঁহার বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদিগকেও স্নেহ করিতেন। কিন্তু লোকে বুঝিয়াছিল এ কৌশল বৈ আর কিছুই নয়, হিন্দুর ত কথা কি?—মুসল-মানেরাও মনে মনে তাঁহার শত্রু ছিলেন। খলের প্রেম ও সসর্প গৃহবাস উভয়ই সমান; বিপদ্ ঘটিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

এই গেল সাধারণ লোকের কথা। হিন্দুরা তাঁহার প্রতি

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার নিমিত্ত উৎপীড়ন করিতেন। এজন্য যে সকল রাজপুত-বীরের ভুজবীর্য্যের জন্য তৈমুর বংশের এত প্রতিপত্তি, অবশেষে তাঁহারাও সম্রাটকে ছাড়িয়া গেলেন। আরঙ্গজীবের বৃদ্ধাবস্থায় যখন চতুর্দ্দিকে বিপ্লব উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা কেহ ফিরিয়াও দেখিলেন না। ওদিকে মহারাষ্ট্রা-নায়ক শিবজী ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত লুকাইয়া ছিলেন; ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া তিনিও অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তুলিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্দেশ কম্পিত হইয়া উঠিল। আরঙ্গজীবের তত তেজঃ,তত উদ্যম,—এখন আর কিছুই নাই। সে প্রখর দীপ-শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন, আজি সেই পাপের জন্য তাঁহার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। তিনি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারেন না। ক্রমে অনুতাপে ক্লিষ্ট, জীর্ণ, পাপ প্রাণ পঞ্চভূত দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া গেল।

আরঙ্গজীব শেষাবস্থায় প্রায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেন। আহ্মদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইস্থানে বিবিধ মস-লায় তাঁহার মৃতদেহ রক্ষিত করা হইয়াছিল। পরেইলোরা ও গোদাবরীর সন্নিকটে রোজা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কথিত আছে, তিনি এক প্রকার টুপী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই টুপী বিক্রয় করিয়াই তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

১১১৯ সালে [১৭১২ খৃষ্টাব্দে] বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী ভুরস্মুট্‌ পরগণায় পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায়; কিন্তু প্রভূত পরাক্রমশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়া তিনি "রায়" ও "রাজা" এই দুই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রা-নায়ক শিবজীর সময় হইতে "বর্গীর হাঙ্গাম" ভারতেতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। অদ্যাপি "বর্গীর হাঙ্গামের" নাম শুনিলে অস্মদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দুর্বৃত্ত নরপিশাচদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৎকালীন প্রধান প্রধান ধনাঢ্য লোকেরা স্ব স্ব বাটীর চতুর্দ্দিকে গড়বন্দী করিয়া রাখিতেন। তদনুসারে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণেরও গৃহের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য গড়বন্দী করা ছিল। এজন্য সেই স্থান অদ্যাপি "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কথিত আছে ভারতচন্দ্রের ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় অধিকার-ভুক্ত ভূমির সীমা সম্বন্ধীয় কোন এক বিবাদসূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণ, বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীৰ্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কতকগুলি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। কীৰ্ত্তিচন্দ্র তৎকালে অত্যন্ত শিশু ছিলেন; মহারাণী দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ব্যথিতা হইয়া "আলমচন্দ্র" ও "ক্ষেমচন্দ্র" নামক দুইজন স্বীয় প্রধান রাজপুত

সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "হয় তোমরা এই ক্রোড়স্থ শিশুটীকে এখনই বিনাশ কর, নয় এই রাত্রির মধ্যেই ভুরস্থট্ অধিকার করিয়া আমার হস্তে প্রদান কর। ইহা না হইলে আমি কখনই জলগ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" সেনাপতিদ্বয় মহারাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেই রাত্রিতেই "ভবানীপুরের গড়" ও "পেঁড়োর গড়" বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাণী বিষ্ণুকুমারী স্বয়ং "পেঁড়োর গড়ে" প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনারায়ণ বা তাঁহার পুত্র ও কর্ম্মসচি-বাদির কেহই নাই; কেবল কতকগুলি স্ত্রীলোক পথি-বিবর্জ্জিতা নিরাশ্রয়ার ন্যায় অধীরা হইয়া হাহাকার করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে অভয়-বাক্য প্রদানে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "তোমাদিগের ভয় নাই, স্থির হও; কল্য একাদশী গিয়াছে, আমি উপবাস করিয়া আছি; আমাকে শালগ্রামের চরণামৃত আনিয়া দেও, তবে আমি জলগ্রহণ করিতে পারি"। পূজক ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ "লক্ষীনারায়ণ শিলা" আনয়নপূর্ব্বক স্নান করাইয়া চরণামৃত প্রদান করিলেন। মহারাণী অগ্রে তাহা গ্রহণ করিয়া পরে একাদশীর পারণা করিলেন। দেব-দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। শালগ্রাম ও অন্যান্য দেব সেবার জন্য কিয়দংশ নিষ্কর ভূমি দান করিয়া ভবাণীপুরে কালী দেবীর ভোগের জন্য প্রতিদিন এক টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া ছিলেন, তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না; কেবল গড়, গৃহ, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি পুনঃ প্রদান করিয়া বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রচুর-বিভবশালী ভূস্বামী পিতাকে হৃতসর্ব্বস্ব ও বহুকষ্টে কালযাপন করিতে দেখিয়া ভারতচন্দ্র পলায়নপূর্ব্বক মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত গাজিপুরের সন্নিহিত "নওড়াপাড়া" নামক গ্রামে স্বকীয় মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে "সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণ" ও "অভিধান" পাঠ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই উভয় গ্রন্থে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাজপুরের নিকটবর্ত্তী সারদা নামক গ্রামে কেশরকুলি-আচার্য্য-বংশীয়া একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। পিতার অজ্ঞাতসারে অযোগ্য কন্যায় বিবাহিত দেখিয়া অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। এই তিরস্কার তাঁহার পক্ষে পুরস্কার হইয়া দাঁড়াইল; কারণ ইহাই তাঁহার ভাবী উন্নতির প্রথম সোপান। বলবতী ইচ্ছার প্রতিরোধ জন্মায় কাহার সাধ্য? ভারতচন্দ্র গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। যতদিন না ভ্রাতৃ-সাহায্য-নিরপেক্ষ ও সংস্কৃত ভাষায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হন, ততদিন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, সংকল্প করিলেন। অতঃপর হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া নামক স্থানের পশ্চিম দেবানন্দপুর নিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব ৺ রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া তিনি পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মুন্সী বাবুরা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাসা ও প্রতিদিন সিধা দিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। ভারতচন্দ্র অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিদ্যাভ্যাসেই নিরত থাকিতেন। কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। দিবসে স্বয়ং একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুই বেলা আহার করিতেন।

প্রায় কোন দিন ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটী বেগুণ পোড়ার অর্দ্ধেক একবেলা ও অপরার্দ্ধেক অন্য বেলা আহার করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

একদা মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে "সত্যনারায়ণ কথা" হইবার আয়োজন হওয়াতে কর্ত্তা বাবু কহিলেন "ভারত! সংস্কৃত ভাষায় তোমার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছে; বিশেষতঃ তুমি বাক্‌পটু; তোমাকেই সত্যনারায়ণের পুঁথি পাঠ করিতে হইবে।" অনন্তর মুন্সী মহাশয় জনৈক লোককে পুঁথি আনয়নের অনুমতি প্রদান করিলে ভারতচন্দ্র কহিলেন "মহাশয়! পুঁথি আনিবার আবশ্যকতা নাই। আমার নিকটেই পুঁথি আছে; পূজা আরম্ভ হউক, আমি বাসা হইতে শীঘ্র পুঁথি আনিতেছি।" এই বলিয়া ভারতচন্দ্র বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল ভাষায় ত্রিপদীচ্ছন্দে উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি রচনা করিয়া সভাস্থদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থ শেষে "ভারত ব্রাহ্মণ কয়" ভণিতি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই ব্রত কথা ব্যতিরেকে চৌপদীচ্ছন্দে তিনি আরও একটী কথা রচনা করেন। এই কবিতা রচনা সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

ভারতচন্দ্র আনুমানিক ১১৩৯ সালে দেবানন্দপুর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় কৃতবিদ্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু ভূমি ইজারা লইয়াছিলেন।

এক্ষণে পিতা ও ভ্রাতৃগণের আদেশে সেই ইজারায় মোক্তার নিযুক্ত হইয়া তিনি বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। ভ্রাতৃগণ কিছুদিন খাজনা দিতে বিলম্ব করিলে রাজা ঐ ইজারা খাস করিয়া লইলেন। ভারত সেই সময়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া কোনরূপে অপরাধী হওয়াতে কারারুদ্ধ হইলেন। কারাধ্যক্ষ করুণ-হৃদয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানের কারাবাস দেখিয়া তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন-ভাবে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

ভারতচন্দ্র রঘুনাথ নামক জনৈক নাপিত-ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া জলেশ্বর পার হইয়া 'মহারাষ্ট্রী" অধিকারের প্রধান রাজধানী কটকে আসিয়া "শিবভট্ট" নামক দয়াশীল সুবাদারের শরণাপন্ন হইলেন ; এবং তাঁহাকে স্বীয় দুরবস্থার কথা নিবেদন করিয়া পুরুষোত্তম ধামে বাস করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি-লেন। সুবাদার তাঁহার প্রার্থনায় প্রীত হইয়া তত্রত্য শাসন-কর্ত্তাকে অনুমতি দিলেন, "ইনি পুরুষোত্তম ধামের সকল স্থানেই বিনা করে বাস করিতে পাইবেন এবং প্রত্যহ আহারের জন্য পুরী হইতে একটী করিয়া 'বলরামী আট্‌কে' প্রাপ্ত হইবেন।" সহচর নাপিত-ভৃত্য ও আপনি দুই জনে তাহা ভাগ করিয়া খাইতেন।

এই স্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাস করিয়া ভারত-চন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবদিগের অন্যান্য অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য পুরুষোত্তম হইতে যাত্রা করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার শ্যালিকা-পতির বাটী। রঘুনাথের মুখে ভারতের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া

শ্যালিকা-পতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং সংসার-ধর্ম্মে তাচ্ছীল্য দর্শনে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সংসারী করিলেন। কিন্তু ভারত, "যত দিন না অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, তত দিন বাটী যাইব না" সঙ্কল্প করাতে পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কয়েক দিন পরে শ্যালিকা-পতি ভারতচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। জামাতার এই নূতন আগমন দেখিয়া অন্তঃপুর মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। ভারতচন্দ্র বিবাহ-রাত্রি ব্যতীত আর কোন দিন প্রণয়িণী সহধর্ম্মিণীর মুখাবলোকন করেন নাই। এক্ষণে পবিত্র-হৃদয়া সহধর্ম্মিণীর সহবাসে কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিয়া ঔদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসারী হইলেন। পতি-গত-প্রাণা প্রেম-প্রফুল্লা রমণী বিপদের সাহস, সম্পদের উৎসাহ, রোগের ঔষধ। ভারতচন্দ্র কয়েক দিন পত্নী-সহবাসে কালাতিপাত করিয়া ভাগ্য-বর্দ্ধন মানসে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন, এবং শ্বশুরকে কহিয়া গেলেন "আমার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা আমার পরিবারকে লইতে আসিলে আপনি পাঠাইয়া দিবেন না।"

অনন্তর তিনি ফরাসডাঙ্গায় গমন করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বিচক্ষণ দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আত্মপরিচয় দেন। দেওয়ান্ মহাশয়ও তাঁহার গুণে প্রীত হইয়া তাঁহার কোন উপকার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। একদা কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন কার্য্যোপলক্ষে দেওয়ান চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। চৌধুরী মহাশয়

ভারতের পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রতিপালনের জন্য রাজাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি মাসিক ৪০ টাকা হারে তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ভারতচন্দ্র প্রত্যহ প্রাঃতকালে ও সায়ংকালে দুইটী করিয়া কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন। রাজা তৎশ্রবণে নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর এরূপ উদ্ভট কবিতা রচনায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া তিনি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কৃত চণ্ডীর প্রণালীতে তাঁহাকে "অন্নদামঙ্গল" লিখিতে অনুমতি প্রদান করেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনায় নিম্নলিখিত শ্লোকে রাজার আজ্ঞা-প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন :—

"আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥"

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনার পর তিনি সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ করেন।

রায় গুণাকর আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তিগুণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এক দিন পরস্পর কথোপকথনের সময় রাজা তাঁহার সাংসারিক বিষয় জানিতে চাহিলে তিনি কহিলেন "আমার স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিয়াছি; ভ্রাতৃগণের সহিত মনোন্তর হওয়াতে বাটী যাইবার ইচ্ছা নাই; উপযুক্ত স্থান পাইলে ঘর বাঁধিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে অভিলাষ আছে।" রাজা বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতকে নগদ ১০০ টাকা ও গঙ্গার ধারে মূলাযোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়া তথায় বাস

করিতে কহিলেন। ভারতচন্দ্র ইজারার সনন্দ পাইয়া প্রথমতঃ কয়েক দিনের জন্য ঘোষালদের বাটীতে অবস্থিতি করেন। অবশেষে স্বীয় গৃহ প্রস্তুত হইলে আপন পরিবার আনাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তাঁহার পিতাও ভারতের আশ্রয়ে আসিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। ভারত যথোচিত পিতৃকৃত্য সমাপন করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়া নানা-বিষয়িণী কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অধিকার কালে মহারাষ্ট্রদিগের দৌরাত্ম্য (বর্গীর হাঙ্গাম) বাঙ্গালা দেশীয় ইতিহাসের সর্ব্ব-প্রধান ঘটনা। তাহাদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্রের মাতা মূলাযোড়ের পূর্ব্বদক্ষিণ কাউগাছী নামক স্থানে গিয়া বাস করেন; এবং মূলাযোড়ের পত্তনি পাইবার জন্য কৃষ্ণনগরে রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া সফল-মনোরথ হন। ভারতচন্দ্র "আমি কোথায় যাইব" বলিয়া জানাইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দপুরের নিকটবর্ত্তী গুস্তে গ্রামে ১৫০/০ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬/০ বিঘা ভূমির স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে গুস্তেতে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের রাণী, রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনি লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কর্ত্তৃত্ব-ভার পাইয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ভারতচন্দ্র তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ও নাগের দংশনে জর্জ্জর হইয়া সংস্কৃত ভাষায় "নাগাষ্টক" নামক আটটী কবিতা রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজা শ্লোকাষ্টক পাঠ করিয়া

যুগপৎ শোক ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিষ-মাগ্নি রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ১১৬৭ সালে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ৪৮ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রায় গুণাকর জীবনের প্রথম ভাগে কতই কষ্ট সহ্য করিয়া-ছিলেন! যিনি বাল্যকালে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও মর্ম্মাহত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন; যিনি নিরাশ্রয়, নিঃসহায় ও পর-প্রত্যাশী হইয়া বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে পরগৃহে বাস করিয়া শাকান্নে দগ্ধোদর পূরণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিয়া-ছিলেন; তিনিই একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভায় প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই মুখে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

সাধক রামপ্রসাদ সেন।

আনুমানিক ১১২৫—১১৩০ সালের (১৭১৮—১৭২৩ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে হালিসহর পরগণার অন্তর্বর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলভূষণ রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্রণীত প্রধান কাব্য "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের" স্থানে স্থানে তিনি যে আত্ম-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম সেনের দুই পত্নী। তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে নিধি-রাম ও দ্বিতীয়ার গর্ভে চারি সন্তান জন্মিয়াছিল। এই চারিটী সন্তানের মধ্যে দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র। প্রথমা অম্বিকা, দ্বিতীয়া ভবানী, তৃতীয় রামপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বনাথ।

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহারই সহিত রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগিনী ভবানীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামক দুই পুত্র জন্মে। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী অম্বিকা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। রামপ্রসাদের রামদুলাল নামক পুত্র, এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা ছিল। কেহ কেহ কহেন রামদুলাল ব্যতীত রামমোহন নামক রামপ্রসাদের আর একটী পুত্র জন্মিয়া ছিল। কিন্তু "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে" রাম মোহনের নামোল্লেখ নাই। রামমোহনের বংশধরেরা অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহারা কহেন "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" রচিত হইবার পর রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল; এজন্য রামপ্রসাদ স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দিভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরানুরক্তি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য তিনি কৌলিক চিকিৎসা-ব্যবসায় শিক্ষা ও অবলম্বন না করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও কবিতারচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন অতীত হইলেই তাঁহার উপর সাংসারিক ভার অর্পিত হইল। রামপ্রসাদ সংসারভারে নিপীড়িত হইয়া অগত্যা এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির বাটীতে মোহরের কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। এই ব্যক্তি কে তাহা ঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য

এরূপ জনশ্রুতি যে ইহাঁর নাম দেওয়ান গোলক চন্দ্র ঘোষাল। কেহ কেহ কহেন ইনিই কলিকাতার অন্তর্গত সোনাগাজী নিবাসী নবরঙ্গকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্র। তিনি চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু বিষয়-বাসনায় তাঁহার বড় বিতৃষ্ণা ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি এরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ ও সংসারবিরাগী ছিলেন যে সামান্য সাংসারিক কর্ম্ম করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, এবং কখনই তাহা সুসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। রামপ্রসাদ মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যে খাতায় মহাজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক পৃষ্ঠের লেখনাবশিষ্ট স্থানে অসংখ্য দুর্গা ও কালী নাম এবং ভক্তি-রস-পূর্ণ নানাবিধ সঙ্গীত রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। এক দিন তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী ঐ খাতা দেখিতে পাইলেন, এবং রামপ্রসাদের এরূপ কার্য্য অত্যন্ত অন্যায় মনে করিয়া তিনি ক্রোধভরে স্বীয় প্রভুর নেত্রগোচর করিলেন।

কখন্ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত হয়, ইহা যেরূপ মনুষ্যের অপরিজ্ঞেয়, কখন্ কোন্ সূক্ষ্মতম সূত্র আশ্রয় করিয়া সৌভাগ্য-সুখ সমুপস্থিত হয়, ইহাও সেইরূপ তাহাদিগের জ্ঞান-বহির্ভূত। প্রসাদের উল্লিখিত ঘটনাটি শুনিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন যে তাঁহার প্রভু তাঁহার ঐ গর্হিতাচরণ দেখিয়া তাঁহাকে অবমানিত ও অপদস্থ করিবেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল ও নিগূঢ় নির্বন্ধ! এই ঘটনাটী রামপ্রসাদের জীবন-স্রোতের পথ পরিষ্কার করিয়া ছিল। তিনি যে প্রভুর অধীনতায় মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তিনি অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতি, গুণগ্রাহী ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। প্রসাদের

কালী-নাম-পূর্ণ ও ভক্তি-রস-বিশিষ্ট সুমধুর সঙ্গীত পাঠ করিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে "আমায় দে মা তবীল দারী। আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী" এই গানটী পাঠ করিয়া তিনি আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কথিত আছে রামপ্রসাদ একলক্ষ গান রচনা করিয়া ছিলেন ;এবং এই গানটীই তাঁহার প্রথম রচিত। একগাছি ক্ষুদ্র তৃণের সঞ্চালন দেখিয়া বায়ুর গতি নিরূপণ করিতে পারা যায়। তিনি এই একটীমাত্র সঙ্গীত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে রামপ্রসাদের জীবন মহাজনী খাতা লেখনাপেক্ষা অনেক উচ্চতর কার্য্যের উপ-যোগী। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে আহ্বান করাইয়া তাঁহার চাকরী স্বীকার করিবার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলেন। রামপ্রাসাদও বিনীত-ভাবে ও সাশ্রুনয়নে প্রভুর নিকট আপনার দারিদ্র্য-দুঃখ জানাইলেন। তিনিও রামপ্রসাদের দুঃখের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়া স্বীয় উদারতা গুণে তাঁহার মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া এই বলিয়া দিলেন যে "আপনার আর অনিত্য সংসার চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতে হইবে না। আমি আপনাকে যে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেছি, আপনি তাহাতেই পরিতুষ্ঠ হইয়া নিশ্চিন্তভাবে দিন যাপন করুন। আপনি যে পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা সমাপ্ত করা মনুষ্যের প্রার্থনীয় এবং তাহা সমাপ্ত করিতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়। অতএব ইহা হইতে আপনাকে স্খলিত করা কোন ক্রমেই আমার উচিত নহে"।

সাংসারিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ না করিলে লোকের স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বাধীনতা কবিত্বের প্রসূতি। রামপ্রসাদ মহারাজ-প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত

হইয়া অনুৎকণ্ঠচিত্তে ঈশ্বরচিন্তনে মন সমর্পণ করিবার প্রকৃত অবসর পাইলেন। অতঃপর তিনি গৃহগমন করিয়া তন্ত্রবিহিত পঞ্চমুণ্ডী আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক সাধনায় অনুরত হন। সর্প, শশ, ভেক, শৃগাল ও নরমুণ্ড লইয়া পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিবার প্রণালী তন্ত্রে উক্ত আছে; কিন্তু রাম প্রসাদের আসন-তলে সিন্দুর-মণ্ডিত পাঁচটী নরমুণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও ভজন-গানে অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া স্বীয় ও পরকীয় পরমানন্দ বিধান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে কাব্য ও ভজন ব্যতীত তিনি কেবল কালীবিষয়ক সঙ্গীতই লক্ষাধিক রচনা করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ যখন মহারাজ-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া নিজগ্রাম কুমারহট্টে বাস করিতে ছিলেন, তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অলৌকিক ঈশ্বর-ভক্তি ও কবিত্ব-শক্তির প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হন। তৎকালে কুমারহট্ট মহারাজের অধিকার ভুক্ত ছিল; এবং তিনি তথায় একটী ধর্ম্মাধিকরণ ও বায়ুসেবনালয় নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। যখন তিনি ঐ স্থানে বায়ুসেবন করিতে আসিতেন, তখন তিনি রামপ্রসাদকে আহ্বান করাইয়া তাঁহার সহিত তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্বন্ধীয় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রসাদের প্রগাঢ় শক্তি-ভক্তি, বিষয়-বাসনা-শূন্যতা, মাহাত্ম্য ও কবিত্ব-শক্তি দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সভাসদ করিবার জন্য মহারাজ অনেক অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় তৎকালে আর কাহারও অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে বা কাহাকেও ভয় করিতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য তিনি মহারাজের অনু-

রোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। গুণগ্রাহী, হৃদয়বান্, উৎসাহ-বর্দ্ধক মহারাজও প্রসাদের অস্বীকারে অধিকতর প্রীত হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন। ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হওয়াতে রামপ্রসাদের আয় বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। কিন্তু আয় বৃদ্ধি হইল বলিয়া যে তিনি পুনর্ব্বার বিষয়-বাসনায় প্রলিপ্ত হইবেন, তাহা এক দিনের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। মহতের উদ্দেশ্য মহৎ, এবং মহতের অর্থ নিজার্থ অপেক্ষা পরার্থেই অধিক বায়িত হইয়া থাকে। দরিদ্রের দারিদ্র্য-দুঃখ দর্শন করিলে রামপ্রসাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত। যাহা কিছু তাঁহার হস্তে থাকিত, অমনি তাহা তিনি দান করিয়া ফেলিতেন।

রামপ্রসাদ বড় কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মহারাজের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি ও ভূমিলাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে নিশ্চিন্ত রহিলেন না। কিন্তু তিনি স্বয়ং দরিদ্র। মহারাজকে কিরূপ প্রতিদান করিবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, মহারাজ ধর্ম্ম গ্রন্থ অপেক্ষা অধিকতর কাব্য-প্রিয় এবং কবিত্ব-শক্তির সবিশেষ গুণগ্রাহী। এজন্য তিনি মহারাজের রুচি ও উদ্দেশ্য অনুসারেই "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" নামক এক খানি কাব্য প্রণয়ণ করিয়া মহারাজকে উপহার প্রদান করেন। রামপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "কালী-কীর্ত্তন"। "কালী-কীর্ত্তন" যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! যিনি সমস্ত জীবন কালীকীর্ত্তনেই অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার "কালী-কীর্ত্তন" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হওয়াই বিস্ময়-

কর! এই গ্রন্থখানি ব্যতীত রামপ্রসাদ "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "শিবসঙ্কীর্ত্তন" নামক আরও দুই খানি কাব্য রচনা করিয়া ছিলেন। কাব্যরচনা অপেক্ষা সঙ্গীত রচনাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার হৃদয়-জলধি শক্তি-প্রেম-তরঙ্গে অহর্নিশ উদ্বেল হইয়া উঠিত; এবং তাঁহার সঙ্গীতাবলী এরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও অভিব্যক্তি মাত্র। তৎকালে সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া গ্রন্থে পরিণত করা এ দেশের রীতি ছিল না; এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য তৎপ্রণীত সঙ্গীতের সহস্রভাগের এক ভাগও প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।

রামপ্রদাস স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাগুণে গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহারাজ তৎসহবাস অত্যন্ত সুখদ মনে করিতেন। তৎকালে এদেশে রেলওয়ে ছিল না; এজন্য বিভবশালী লোক আমোদ আহ্লাদের জন্য সময়ে সময়ে জল বিহারে বহির্গত হইতেন। এক দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাপথে মুরশিদাবাদ যাইতে ছিলেন। রামপ্রসাদ বজ্রায় বসিয়া স্বীয় কালীকীর্ত্তন সঙ্গীতে মহারাজের কর্ণকুহরে অমৃত স্রোত প্রবাহিত করিতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাও তৎকালে গঙ্গাপথে জলবিহারে বহির্গত হইয়া ছিলেন। নবাবের ডঙ্কাধ্বনি শ্রবণ ও নৌকোপরি পতাকারাজি দর্শন করিয়া মহারাজ ও রামপ্রসাদ স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন; এবং নবাবের যথোচিত সম্মান করিবার জন্য তাঁহার সমীপে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সিরাজও উৎসুক হইয়া মহারাজের

বজ্রা থামাইবার জন্য আদেশ দিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গায়ককে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে গান করিতে অনুমতি করিলেন। তৎকালে এ দেশের সকলেই সিরাজের আচার ব্যবহার ও রুচির বিষয় অবগত ছিল। রামপ্রসাদও সিরাজের মনস্তুষ্টির জন্য হিন্দি, খেয়াল ও গজাল গান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য মহিমা এবং ধর্ম্ম-সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি! প্রসাদের প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট কালী-কীর্ত্তন শুনিয়া অবধি নবাবের মন বিমোহিত হইয়াছিল। তিনি প্রসাদের হিন্দি, খেয়াল ও গজাল গানে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কহিলেন যে "আমি তোমার ঐ সকল গান শুনিতে চাই না। তুমি ইহার পূর্ব্বে বজ্রায় বসিয়া "কালী কালী" বলিয়া যে গানটী গাইতে ছিলে, সেই গানটী গাও"। রামপ্রসাদও নবাবের আদেশ মত তাঁহাকে সেই গানটী গাইয়া শুনাইলেন। প্রেমিক ও সাধকের সঙ্গীত সকলকেই মোহিত করিয়া দেয়। রামপ্রসাদের কারুণ্যব্যঞ্জক, সুললিত ও অমৃতময় সঙ্গীতস্রোতে সিরাজের পাষাণ-হৃদয় প্লাবিত ও দ্রবীভূত হইয়া গেল।

কুমারহট্টনিবাসী অযোধ্যারাম গোস্বামী নামক জনৈক লোক রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় সাধারণতঃ "আজো গোঁসাই" বলিয়া পরিচিত। অনেকে তাঁহাকে "পাগল" বলিয়াও ডাকিত। কিন্তু তিনিও যে একজন সুকবি ও পরম ভাবুক, এবং রামপ্রসাদের ন্যায় একজন ধর্ম্ম-পাগল ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ কালী ভক্ত, ইনি হরি ভক্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চির-প্রসিদ্ধ। ইঁহাদেরও মধ্যে তাহার ন্যূনতা ছিল না। রাম-

প্রসাদ যখন যে গান গাইতেন, গোস্বামী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আধ্যাত্মিক ভাবে তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দিতেন। এইরূপে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উভয়কে একত্র করিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম্মদ্বন্দ্ব দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। উভয়ের মধ্যে অনেকানেক ধর্ম্ম যুদ্ধ হইত। এক দিন রামপ্রসাদ গাইলেন, "ভাই, এ সংসার ধোঁকার টাটি"। আজো গোঁসাই উত্তর করিলেন "এ সংসার সুখের কুটি। যার যেমন মন, তেম্নি ধন, মন কররে পরিপাটি; ওহে সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামটি। ওরে শিবের ভাবে ভাবনা কেন, শ্যামা মায়ের চরণ দুটি, জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতেই ছিল না ক্রটি। সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেতে পেতো দুধের বাটি''।

রামপ্রসাদ একজন সুপণ্ডিত, সুভাবুক ও পরম সাধক ছিলেন। তাঁহার হৃদয়বত্তা-পূর্ণ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাঁহার জীবনের কতকগুলি অলৌকিক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, একদা রামপ্রসাদ স্নান করিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় স্বয়ং অন্নপূর্ণা কাশী হইতে ষোড়শী মানবীর মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার গান শুনিতে আসিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়ং ঈশ্বরী তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী রূপে তাঁহার ঘরের বেড়া বাঁধিয়া দেন। তৃতীয়তঃ, স্বয়ং শিবা শিবা-রূপে তাঁহার হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। চতুর্থতঃ, গাব-গাছ হইতে পদ্ম নামাইয়া প্রসাদ কালীপূজা করিয়া ছিলেন। এই সকল ঘটনা সাংসারিক ভাবে অলৌকিক ও অসম্ভব; কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে সম্পূর্ণ সম্ভব। ঈশ্বর স্বয়ং উপদেষ্টা

ও অধিনায়ক হইয়া ভক্তের সুমতিদান ও তাঁহাকে সৎপথে চালিত করেন; দুর্ব্বহ-পাপ-ভার-ভগ্ন পরমাত্মার পুনর্ব্বার জীর্ণ-সংস্কার করেন; সাধক প্রার্থনা করিলেই তাঁহাকে তাঁহার আকাঙ্খিত বস্তু প্রদান করেন, এবং যাহা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহাও তিনি সাধকের সাধন প্রভাবে সম্ভব-পর করিয়া তুলেন, ইহা আর বিচিত্র কি! রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটী আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ধীরপ্রকৃতি ও জ্ঞানী লোকে প্রায়ই মৃত্যুর আসন্নকাল অনুভব করিতে পারেন। রামপ্রসাদও মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিয়া কালী পূজা করেন; এবং পরদিন বিসর্জ্জনের সময় শক্তি-গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। তথায় অর্দ্ধনাভি জলে দণ্ডায়মান হইয়া "মাগো! আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হইয়াছে" এই গানটি গাইবা মাত্রই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগে তাঁহার মৃত্যু না হইয়া ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রাম নামক স্থানে ১২২২ সালে [১৮১৫ খৃষ্টাব্দে] মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লিপিকরের কার্য্য করিতেন। রামধনের দুই পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ মদনমোহন ও কনিষ্ঠ গোপীনাথ। রামধন চট্টোপাধ্যায়

লিপিকর-কার্য্য হইতে অপসৃত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর রামরতন চট্টোপাধ্যায় উক্ত পদে নিযুক্ত হন। আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে মদনমোহন পিতৃব্য কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হইয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। কলিকাতায় কিছুকাল থাকিয়া উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলে তিনি বাটী গমন করেন; এবং সুস্থ হইলে পর নিজ গ্রামস্থ এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। বাটীতে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে পুনঃ প্রবিষ্ট হন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র ছিল। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় এক শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। অচিরাৎ উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়া উঠিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মদনমোহন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষা কথঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পঠদ্দশাতেই সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে "রস তরঙ্গিনী" ও বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে "বাসবদত্তা" প্রণয়ন করেন। তাঁহার অলঙ্কারাধ্যাপক সুধীবর প্রেমচাঁদ তর্ক-বাগীশ ও সাহিত্যাধ্যাপক সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তদীয় কবিত্ব শক্তির মনোহারিত্ব দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতা বাঙ্গালা পাঠশালার প্রথম শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে

বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম্ ও কৃষ্ণনগর কলেজে যথাক্রমে অধ্যাপকতা করিয়া অবশেষে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সুমিষ্ট বচন বিন্যাস, সুললিত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ এবং রসময়ী অধ্যাপনায় তদীয় ছাত্রগণ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইত। নিরহঙ্কারতা, চিত্ত-সমুন্নতি, বাল্যকাল-সুলভ চাপল্য ও অমায়িকতায় তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিন বৎসর মাত্র সংস্কৃত কলেজে থাকিয়া তিনি কতকগুলি দেশ হিতকর কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহারই অধ্যবসায় বলে "কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র" নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত এবং অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। তৎকালে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ বেথুন সাহেব তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করেন। উভয়েই অজ্ঞান-তিমিরাবৃতা বঙ্গ-কুল-কামিনীদিগের উন্নতি সাধনে উৎসুক হইয়া বেথুন বিদ্যালয় নামক একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু কেহ কন্যা দিতে অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে তর্কালঙ্কার মহাশয় ভুবনমালা ও কুন্দমালা নামক স্বীয় কন্যাদ্বয়কে সর্ব্বপ্রথমে বেথুন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া সাধু দৃষ্টান্তের পরিচয় প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের জজ অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপক তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় তদীয় দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন। কিন্তু তৎকালে বালিকাগণের পাঠোপযোগী কোন পুস্তক না থাকাতে তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিন ভাগ "শিশু শিক্ষা" প্রণয়ন করেন। "শিশু শিক্ষা" তিন খানির রচনা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে

বালক বালিকাগণের এরূপ পাঠোপযোগী পুস্তক বঙ্গভাষায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"শিশু শিক্ষা" ত্রয়ের রচনা দেখিয়া বেথুন সাহেব তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "মদন! তোমার 'শিশু শিক্ষা' রচনায় আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি তোমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করি। বল, কি উপকার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও।" তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদূর উন্নতচেতা ও তেজস্বী ছিলেন যে তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন "মহাশয়! আপনি বিপুল জলধি অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গকামিনীদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তন্মোচনের চেষ্টায় এই বালিকা বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি বঙ্গবাসী; বিদেশীয় মহাত্মা আমাদের দেশীয় রমণীগণের দুর-বস্থা মোচনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমি তাঁহার চেষ্টায় সাহায্য মাত্র করিয়াছি। ইহাতে আমি কিসে পুরস্কারের যোগ্য!" ইহা শুনিয়া বেথুন সাহেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক তাঁহার উপকার করিতে সচেষ্ট রহিলেন।

কিয়দ্দিন মধ্যেই মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে উক্ত পদ প্রাপ্তির জন্য বেথুন সাহেবের নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। তিনি ঐ পদে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে ঐ স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হন। মদনমোহন মুরশিদাবাদে আবাল বৃদ্ধ

সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি মুরশিদাবাদে একটী অতিথিশালা ও আর একটী দাতব্য-সভা সংস্থাপন করেন। এই সময়ে তদীয় বন্ধু বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়। ইহাতে মদনমোহন যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

মুরশিদাবাদে এক বৎসর থাকিয়া তিনি কান্দী নামক স্থানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। মুরশিদাবাদের ন্যায় কান্দী-তেও তিনি একটী অনাথ মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, এবং বালিকা বিদ্যালয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় জজ পণ্ডিতের পদ পরিত্যাগ করিলে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঐ পদে নিযুক্ত হন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথমে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ অপরাধে তিনি আট নয় বৎসর কাল সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

মাকালতোড় নামক স্থানে দুইজন ধনশালী দুর্দ্দান্ত মুসল-মান জমীদার তাহাদের কোন পর্ব্বোপলক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কিন্তু ইহাতে বহুসংখ্যক নরহত্যা হইত। ইহা নিবারণের জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং একদল পুলিশ সৈন্য ও আর একজন বিশ্বস্ত দ্বারবান্ সহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ভয়চিত্তে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হই-লেন। কিন্তু বহুসংখ্যক সৈন্য আক্রমণ করাতে তিনি সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হন। ইহা দেখিয়া বিপক্ষ সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। তিনিও দ্বারবান্ কর্ত্তৃক গৃহে আনীত

হইয়া স্বস্থকায় হইলেন। কিন্তু প্রধান বিচারালয়ে অভিযোগ করিলে তিনি প্রমাণাভাবে বিচারে পরাজিত হইলেন। ইহাতে তর্কালঙ্কার আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১২৬৪ সালে ২৭ ফাল্গুন (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মার্চ্চ) তারিখে মানবলীলা পরিত্যাগ করেন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরে চানক নামক একটী ক্ষুদ্র নগর আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী জব্ চার্ণক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম চাণক হইয়াছে। ইহার অন্যতর নাম বারাকপুর, এই স্থানে সম্প্রতি ইংরাজ-দিগের একটী সেনানিবেশ হইয়াছে। এই সেনানিবেশের অনতিদূরে মণিরামপুর নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে [১২১৭ সালে] এই স্থানে দুর্গাচরণ একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণের পিতা গোলোক-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রধান কুলীন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এজন্য তাঁহার প্রতিবাসিগণ তাঁহার অত্যন্ত সমাদর ও সম্মাননা করিতেন। দুর্গাচরণ পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন।

দুর্গাচরণ ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষা প্রথম শিক্ষা দিবার জন্য একজন "গুরু-মহাশয়" নিযুক্ত করিয়া দেন। দুর্গাচরণ অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহ

সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বড় লোকের বাল্য-কালে অনেক অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি এই সময় এমন একটী কার্য্য করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার অগাধ সাহস ও নির্ভীকতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিন দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পাঠশালা হইতে পড়িয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে এক জন সইস সৈন্য দলের কর্ণেল সাহেবের একটী ঘোড়াকে তাহাদের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইতেছে। বাল্য-কাল-সুলভ চাপল্যবশতঃ বালকগণ ঘোড়াটীকে লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল! সইসও ক্রুদ্ধ হইয়া বালকগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। বালকগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্গাচরণ সেরূপ না করিয়া নির্ভয়চিত্তে সেই স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলেন। সইস তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে কর্ণেল সাহেবের নিকট লইয়া গেল। দুর্গাচরণ পথে তাহাকে বলি-লেন "আমি কিছুই করি নাই। আমার কোন দোষ নাই। তুমি আমাকে সাহেবের নিকটা লইয়া গেলে আমি সাহেবকে সমস্ত সত্য কথা বলিয়া দিয়া তোমাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া-ইব।" কর্ণেল সাহেবের নিকট আনীত হইলে দুর্গাচরণের মুখে কিছুমাত্র ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন "আমি আপনার ঘোড়াকে ঢেলা মারি নাই। আমার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহারাই ঢেলা মারিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আপ-নার সইস কেন আমাকে বৃথা ধরিয়া আনিল ?" কর্ণেল সাহেব বালক দুর্গাচরণের মুখে কিছুমাত্র ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া ও তাঁহাকে তেজস্বিতার কথা কহিতে শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও

তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্গাচরণের পিতা এই সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন "আমি এই বালকের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই বালক উত্তরকালে আপনাকে অত্যন্ত সুখী করিবে।"

দুর্গাচরণের দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি "সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টে" অর্থাৎ বিদ্যালয়ের উচ্চতম বিভাগে উন্নীত হয়েন; এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রখর-ধী-শক্তি ও প্রাকৃতিক প্রতিভা বলে তিনি প্রভূত সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও গণিত শাস্ত্রে তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল; এবং এই দুইটী বিষয়ে তিনি তদীয় সহাধ্যায়ীদিগকে পরাজিত করিয়া কলেজ হইতে একটী মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই সময় হইতেই হিন্দুজাতির অনুষ্ঠেয় আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ও বিদ্বেষ দেখা যাইতে লাগিল। একদা দুর্গাচরণ প্রাতঃকালে আহার করিয়া হস্তপ্রক্ষালন মানসে জলপূর্ণ জালার মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিয়া দেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে এরূপ অসদাচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভয় দেখান যে তিনি এ বিষয় তাঁহার পিতাকে বলিয়া দিবেন। দুর্গাচরণ পিতাকে বড় ভয় করিতেন। মাতার কথা শুনিয়া ও দ্বিরুক্তি প্রকাশ না করিয়া নিঃসম্বলে পদব্রজে তিনি বাঁকুড়ায় পলাইয়া গেলেন। বাঁকুড়ায় তাঁহার কেহই পরিচিত ছিল না। সঙ্গে কিছু মাত্র অর্থ না থাকাতে দুই চারি দিন তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়া-

ছিল। কিন্তু তিনি বড় সাহসী ও সুচতুর ছিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তত্রত্য জনৈক দোকানদারের সহিত আলাপ করিয়া তাহার গৃহে কয়েক দিন অতিথি হইয়া রহিলেন। দোকানদার বড় দয়ালু ছিল। সে ব্যক্তি ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের দুঃখে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বাঁকুড়ার তৎকালীন মুন্সেফ বিখ্যাতনামা হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিল। হরচন্দ্র বাবু তাঁহাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিয়া কলিকাতায় দুর্গাচরণের পিতাকে একখানি পত্র লেখেন। পিতাও পত্রপাঠ মাত্র বাঁকুড়ায় গিয়া দুর্গাচরণকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

দুর্গাচরণের পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ নানা কারণে এই সময়ে তাঁহার অবস্থা আরও হীন হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি পুত্রকে বলিলেন "আর আমি তোমার পড়িবার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে পারি না। তুমি যে রূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট। এখন তোমাকে আমার সহিত সলট্ বোর্ডে অর্থাৎ "নুন গোলায়" কর্ম্ম শিক্ষা করিতে যাইতে হইবে। পিতার আদেশ বাক্য শুনিয়া দুর্গাচরণ মর্ম্মাহত হইলেন। পিতৃ-দারিদ্র বশতঃ জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধিমান্ পুত্র মনোমত বিদ্যা শিক্ষা করিতে না পারিলে তাঁহার মনে যেরূপ কষ্ট উপস্থিত হয়, দুর্গাচরণেরও মনে তখন সেইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না; এজন্য তাঁহাকে অগত্যা চাকরীর অন্বেষণে বহির্গত হইতে হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে কোন এক সদ্বংশসম্ভূতা বালিকার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়।

দুর্গাচরণ সুনগোলায় কর্ম্ম করিতে গেলেন বটে, কিন্তু বলবতী জ্ঞানপিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইল না। কলিকাতার বিখ্যাতনামা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তৎকালে সুনগোলার দেওয়ান ছিলেন। এক দিন দুর্গাচরণ আর থাকিতে না পারিয়া দ্বারকানাথের নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেন। গুণগ্রাহী দেওয়ান বাহাদুর দুর্গাচরণের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত ও তাঁহার জ্ঞানপিপাসায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন; এবং দুর্গাচরণের পিতাকে আহ্বান করিয়া দুর্গাচরণকে হিন্দুকলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। অর্থাভাব নিবন্ধন পুত্রকে কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে দুর্গাচরণের পিতা যে আপত্তি উত্থাপন করিলেন, দ্বারকানাথ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; এবং স্বীয় খাতাঞ্জিকে কহিয়া দিলেন যে "তুমি গোলোকনাথের বেতন হইতে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দুর্গাচরণকে বিদ্যালয়ের বেতন দিবে।" এইরূপে দুর্গাচরণ যদিও হিন্দু কলেজে পুনঃপ্রবেশ করেন, তথাপি তাঁহাকে অধিক দিন তথায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয় নাই। বহু পরিবারের একমাত্র আশ্রয় ও প্রতিপালক পিতার হীনাবস্থাই তাঁহার কলেজে পড়িবার প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। অগত্যা তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা কিছুমাত্র মন্দীভূত না হইয়া বরং ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসামান্য অনুরাগ সহকারে শিক্ষক-নিরপেক্ষ হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বাঙ্গালী-বন্ধু মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব বাঙ্গালী

সন্তান দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য নিজ ব্যয়ে কলুটোলায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। তিনি এদেশে আসিয়া যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিদ্যালয়ের ব্যয়ভারেই ব্যয়িত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার বিদ্যলয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়, এবং তিনি দুর্গাচরণের ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে নিজ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। হেয়ার সাহেবের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল; এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল তাঁহাকে বিশ্রাম দিবেন, এই মর্ম্মে তিনি সাহেবকে এক খানি আবেদন পত্র দেন। সাহেবও তাঁহার আবেদন পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সময় চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য তাঁহার অবসর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে দুর্গাচরণের জীবনে একটী অভাবনীয় ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের কার্য্যকলাপ বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। আমরা আপাততঃ যাহাকে দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করি, তাহাতে হয়ত তিনি আমাদের কত মঙ্গলময় হিতানুষ্ঠান করিয়া রাখিয়া দেন। এক দিন তিনি ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করাইতে ছিলেন, এমন সময়ে বাটীর এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদ দিল। দুর্গাচরণও আর থাকিতে না পারিয়া বাটী গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্ত্রী এক দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের মত তৎকালে এদেশে সুচিকিৎসক বড় দুর্লভ ছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর জনৈক চিকিৎসক লইয়া

বাড় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! বাটী না আসিতে আসিতেই তাঁহার স্ত্রী প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রীবড় গুণবতী ছিলেন; এজন্য দুর্গাচরণ তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত ছিলেন। যথাসময়ে চিকিৎসার অভাবে স্ত্রীর মৃত্যু হইল, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ-শোকে তিনি উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়া ছিলেন; এবং যথাসময়ে সুচিকিৎসকের অভাবে ও গোবৈদ্যের অধীনতায় চিকিৎসিত হইলে যে কি বিষময় ফল সমুৎপন্ন হয়, তাহা এখন হইতেই তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধ করিতে পারিলেন। এই উপলব্ধিই তাঁহার ভাবী উন্নতির প্রথম সোপান। যদিও পত্নীবিয়োগ-শোকে তিনি প্রথমতঃ উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই শোক মন্দীভূত হইয়া আসিল; এবং তখন হইতেই তাঁহার এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে চিকিৎসকের অজ্ঞানতাই তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর একমাত্র নিদান। তৎকালে কলিকাতায় সুচিকিৎসার জন্য ইংরাজেরা কোন রূপ উপায় উদ্ভাবন করেন নাই! এই অভাব দূরীকরণার্থ তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, স্যার এড্‌ওয়ার্ড রাইন্, ডেভিড্ হেয়ার ও এদেশীয় বহুসংখ্যক দেশহিতৈষী মহাত্মা বাঙ্গালী দিগের সাহায্যে কলিকাতায় "মেডিক্যাল্ কলেজ" সংস্থাপিত হয়। এই দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে এ দেশের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীতং। দুর্গাচরণের পত্নী-বিয়োগের পর হেয়ার সাহেব জোন্স্ নামক জনৈক সাহেবকে নিজ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া অপসৃত হইলে পর দুর্গাচরণকে বিদ্যালয়ের

শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। জোন্স সাহেব অধ্যক্ষ-নিযুক্ত হইয়া দুর্গাচরণকে কহিলেন "আপনি আর প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া অবকাশ পাইবেন না।" ইহাতে দুর্গাচরণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়-পরিত্যাগই তাঁহার উন্নতির প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

যখন "মেডিক্যাল কলেজ" প্রথম স্থাপিত হয়, তখন জাতি ও সমাজ চ্যুতি ভয়ে কেহই তথায় অধ্যয়ন করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু দুর্গাচরণ ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি সমাজভয়ে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। যাহা তিনি সৎকর্ম্ম বলিয়া স্থির করিতেন, অমনি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। তখন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অনেকেই কলেজে অধ্যয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি পাঁচ বৎসর কাল "মেডিক্যাল কলেজে" অধ্যয়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী পাঠ করিলেই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইবে। তৎকালে কলিকাতায় "মেস্তার্স জার্ডিন্ স্কিনার্ এণ্ড কোম্পানির" একটী আফিস ছিল। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক তথায় মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তিনি এক দিন অকস্মাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন; এবং অনেকানেক ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু কাহারও চিকিৎসা ফলবতী

হইল না। অবশেষে তৎকালীন ইংরাজ চিকিৎসকগণের শিরোভূষণ ডাক্তার জ্যাকসনকে দিয়াও চিকিৎসা করান হইয়া ছিল, কিন্তু তিনিও রোগীর কিছুমাত্র উপকার করিতে পারি-লেন না। তখন রোগীর আত্মীয়গণ দুর্গাচরণকে আনয়ন করি-লেন; এবং তিনি আসিয়া রোগীর আকৃতি, প্রকৃতি ও নাড়ী পরীক্ষা করণান্তর এরূপ ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গেলেম যে, তিনিই রোগীর ধন্বন্তরি হইয়া পড়িলেন। দুই চারি বার ঔষধ খাইতে খাইতে রোগীর রোগ অনেকাংশে প্রশমিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। দুর্গাচরণের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র খানি ডাক্তার জ্যাক্সন্ সাহেবকে দেখান হইয়াছিল; এবং তিনি ইহা দেখিয়া কহিয়াছিলেন যে "রোগ ঠিক ধরা পড়িয়াছে; এবং তদনুরূপ ঔষধেরও ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে"। দুর্গাচরণের এতাদৃশী ক্ষমতা দেখিয়া কলিকাতার তৎকালীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাকে "নেটিভ্ জ্যাক্সন্" বলিয়া ডাকিতেন। এই সময় হইতেই চিকিৎসা শাস্ত্রে চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

গুণগ্রাহী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও চিকিৎসা-শাস্ত্র-নিপুণ বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত দুর্গাচরণের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজে মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে খাতাঞ্চির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনিও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কিয়দ্দিন তথায় কর্ম্ম করেন। পরে ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। দুই

চারি বৎসরের মধ্যে তিনি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এক জন সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ বড় কোমল ছিল। দূরদেশাগত বহুসংখ্যক নিরাশ্রয় ও নিরন্ন রোগী দিগকে আশ্রয় ও অন্ন দান এবং তাহা দিগের রোগ নিবারণ করিয়া নিজব্যয়ে তাহাদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে তিনি গৃহে বসিয়া শত শত রোগীর চিকিৎসা করিতেন; এবং তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন "ধনী লোক দিগকে চিকিৎসা করিবার অনেক ডাক্তার আছেন; কিন্তু দরিদ্র লোক দিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার খুব কম লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য অগ্রে দরিদ্র লোক দিগকে চিকিৎসা করিয়া পরে ধনী লোক দিগকে চিকিৎসা করিব"।

হাকীম, কবিরাজ ও ইংরাজ ডাক্তারগণ যে সকল ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া রোগীর জীবনের আশা একবারে পরিত্যাগ করিতেন, দুর্গাচরণ অধিকাংশস্থলে সেই সকল রোগ প্রশমিত করিতে পারিতেন। শুনিতে পাওয়া যায় একদা কোন গভর্ণর জেনারলের স্ত্রী কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ইংরাজ ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহার রোগ নির্ণয় বা তাঁহাকে রোগ হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে দুর্গাচরণকে চিকিৎসা করাইবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি গভর্ণর সাহেবের প্রাসাদে গিয়া দেখিলেন, রোগীর চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক ইংরাজ ডাক্তার ও ভদ্রলোক দুঃখিত ভাবে বসিয়া আছেন।

অনেক ইংরাজ ডাক্তার আপনা আপনি বিদ্রূপ ভাবে কহিতে লাগিলেন যে "ইনি এক জন কালা বাঙ্গালী! ইনি আবার এই রোগ আরাম করিবেন"। তখন দুর্গাচরণ প্রশান্ত ভাবে রোগীর নিকট গিয়া তাঁহার রোগ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনয়নে রোগীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন, এবং সমবেত সাহেবগণ ও গভর্ণর জেনারলকে কহিলেন "আপনারা দুই চারি মিনিটের জন্য এস্থান হইতে চলিয়া যান"। সকলে গৃহ পরিত্যাগ করিলে তিনি মেম সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া রোগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া দুই একটী দেশীয় মুষ্টিযোগে তাঁহাকে পীড়ামুক্ত করিলেন। সাহেবগণ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তখন গভর্ণর জেনারল অত্যন্ত প্রীত হইয়া দুর্গাচরণকে প্রচুর অর্থ দান করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্গাচরণ অর্থের দিকে বড় লক্ষ্য রাখিতেন না। তিনি অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিলে অনেক টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। তথাপি চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ৫।৭ বৎসরের মধ্যে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক প্রণালীতে চিকিৎসা আরম্ভ করিলে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মহা বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। চিকিৎসক-কুল-ভূষণ মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক প্রণালীর উপযোগিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তৎকালে মেডিক্যাল কলেজে অনেকবার

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পক্ষপাতশূন্য ও কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত দুর্গা-চরণের নিকট সকল শাস্ত্রই আদরণীয়। তিনিও অনেক রোগে এলোপ্যাথিক অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

এই এক অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দুর্গাচরণ অত্যন্ত মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য কারণে ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া আসিল। এই সময়ে তাঁহার সুযোগ্য ও গুণবান্ পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ এক দিন জনরব শুনেন যে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে সিবিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এই দুঃসম্বাদ পাইয়া তাঁহার নষ্টসাস্থ্য আরও বিনষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। পরে যখন সুরেন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠ করিয়া জানিলেন যে পরীক্ষার কমিসনরগণ তাঁহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিবেন, তখন তাঁহার নিরাশহৃদয়ে আশাবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাকে আর পরীক্ষোত্তীর্ণ বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে হইল না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন; এবং চারি দিন জ্বর ও কাশরোগ ভোগ করিয়া ২২এ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয়া পত্নী, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। দুর্গাচরণ বাবু বড় ভাগ্যবান্ পুরুষ। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কৃতবিদ্য, সুলেখক ও বাগ্মীপ্রবর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক্ষণে "বেঙ্গলি" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী সংবাদ পত্রের

সম্পাদক, "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের" ও শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর অধিনেতা এবং দেশহিতকর বহুবিধ কার্য্যকলাপের অধিষ্ঠাতা। তিনি কয়েকটী বিদ্যালয় ও একটী কলেজ স্থাপন করিয়া বহু সংখ্যক ছাত্রকে দক্ষতার সহিত শিক্ষা দিতেছেন। তিনি এক জন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক, সুযোগ্য লেখক, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। তাঁহার ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বাবুও বিলাতে গিয়া "ব্যারিষ্টার সিপ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি বলবীর্য্যে দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতির গৌরবসূর্য্য।

দুর্গাচরণ তুমি ধন্য! তোমার চিকিৎসার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুর্ব্বোধ মানবপ্রকৃতির গূঢ়তম প্রদেশে গমন করিবার ক্ষমতাই বা কিরূপ তোমার বলবতী ছিল! তুমি গৃহের পার্শ্ব-দেশ দিয়া চলিয়া গেলেও সেই গৃহে জীবিত ব্যক্তির আসন্নকাল অনুভব করিতে পারিতে; এবং শ্মশান হইতেও মৃতপ্রায় রোগীর হৃদয়ে জীবন সঞ্চার করিয়া তাহাকে তুমি গৃহে ফিরাইয়া আনিতে। তুমি গৃহে পদার্পণ করিলেই রোগীর আত্মীয়গণ তোমাকে ধন্বন্তরি বলিয়া মনে করিত: এবং শয্যাগত, যন্ত্রণাগ্রস্ত ও মুমূর্ষ রোগী তোমাকে দেখিলেই বল, শান্তি ও জীবনপ্রাপ্তি বিষয়ে আশ্বাস লাভ করিত। তুমি কত শত নিরাশ্রয় ও নিরন্ন দরিদ্রকে আশ্রয় ও অন্ন দান করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে কাড়িয়া লইয়াছ; কত শত হৃদয়সর্ব্বস্ব পুত্রকন্যাকে কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া উপায়-বিহীন বৃদ্ধ পিতামাতাকে আত্মহত্যা করিতে দাও নাই; এবং কত শত স্বামীর জীবন দান করিয়া বিয়োগ-ভয়-বিধুরা সজল-নয়না পতিব্রতা কুলকামিনীর অশ্রুমোচন করিয়াছ, তাহা কে বলিতে পারে! দুর্গাচরণ! তোমার প্রতিভাশক্তি কি বলবতী।

সেই প্রতিভাশক্তি বলেই তুমি স্বীয় কার্য্যে সফল হইয়া আপনার নাম দেদীপ্যমান করিয়া গেলে! তোমার মত গুণবান্ পুত্র ভারতভূমির অদৃষ্টে বোধ হয় আর জন্মিবে না। ভারতভূমি! তুমি বড় ভাগ্যবতী, কারণ এরূপ সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে; কিন্তু আবার দেখি, তুমি বড় দুরদৃষ্টা; কারণ এরূপ সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া তুমি এখনও জীবিত আছ!

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ নামক গ্রামে ১৭৪২ শকে [১৮২০ খৃষ্টাব্দে] ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন; ইহাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করিব এরূপ ইচ্ছা শৈশবাবস্থা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মনে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বড় লোকের বাল্যকালের প্রকৃতিই এইরূপ। অর্থহীন পিতা জ্ঞানপিপাসু পুত্রের বিদ্যাশিক্ষোপযোগী ব্যয় ভার সম্পাদনে অক্ষম হইলে পুত্রকে যেরূপ কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রকেও তাহা যথেষ্ট করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অমিত অধ্যবসায়, আন্তরিক আগ্রহ ও অবিচলিত ধৈর্য্য প্রভাবে তিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরসিংহ হইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবেশ করাইয়া দেন; বাল্যকাল

হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা ও অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি বড় বলবতী ছিল। তিনি যখন যে শিক্ষকের নিকট যাহা শিক্ষা করিতেন, কদাপি তাহার মর্ম্মভেদ ও তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। শিক্ষকগণও তাঁহার ভূয়সী জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে অধিক শিক্ষা দান করিতে সমধিক যত্নবান্ হইতেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়াই তিনি প্রথমতঃ গঙ্গাধর তর্ক-বাগীশের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পরে ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবিশেষ অধিকার জন্মিলে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমানন্দ তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যা-বাচস্পতির নিকট বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট স্মৃতি, এবং নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিষ্য বুদ্ধিমান্ হইলে গুরুও তাহাকে শিক্ষা দান করিতে নিরতিশয় প্রয়াসবান্ হন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন যে শাস্ত্র অবলম্বন করিতেন, তখন তাহার নিগূঢ় রহস্যভেদ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে ক্রমে উপরি-উক্ত সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলে, উল্লিখিত অধ্যাপকগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে "বিদ্যা-সাগর" এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগরের যশঃগৌরব চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইহাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুচারু অধ্যাপনা কার্য্য দর্শনে প্রীত হইয়া সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইহাঁকে উক্ত কলেজের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদ প্রদান

করেন। কিন্তু তিনি পর বৎসরেই উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজে পুনঃ প্রবেশ করেন, এবং তথায় "প্রধান লেখকের" পদে নিযুক্ত হন। ফোর্টউইলিয়ম কলেজে অবস্থান কালে কাপ্তেন মার্শ্যাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিক্ষা করিতে অনুরোধ করেন; এবং তখন হইতেই ইনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তৎকালে সিভিলিয়ানদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত হিন্দী ভাষা প্রয়োজন হইত; এজন্য বিদ্যাসাগরকে হিন্দী শিক্ষাও করিতে হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি এরূপ কার্য্য-দক্ষতা ও কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন যে এই কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে তদুপযুক্ত আর একটী বৃহৎ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের প্রধান সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার নানা বিষয়ে প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখিয়া তৎকালে এদেশীয় সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবগণ তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের যত্ন ও অনুরোধে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সর্ব্ব প্রধান অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক নিযুক্ত হই-লেন। তাঁহার পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের সময়ে কলেজে অনেক গুলি কুনিয়ম ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সকল দূরীভূত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অনেকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করেন। তৎকালে এদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বড় অল্প ছিল; এবং যে কয়েকটী বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে সুন্দররূপে শিক্ষাকার্য্য প্রণালী অব-লম্বিত হইত না। এজন্য গভর্ণমেণ্ট ইহঁাকেই সাধারণ বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভার সমর্পণ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন সেক্রেটারী হ্যালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের সবিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। এই সময়ে এদেশে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার বহু প্রচার জন্য গভর্ণমেণ্ট বড় যত্নবান্ হইয়া ছিলেন; এবং কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষার্থী-দিগের উক্ত ভাষা দুইটীতে বিশেষ অধিকার জন্মে, তাহা জানিবার জন্য হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর "স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর" নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা প্রদেশান্তর্গত ৪টী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মডেল স্কুল স্থাপিত হইয়া ছিল; এবং এই সকল স্কুলের পরিদর্শনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। তৎপূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার পরমোৎসাহী বেথুন সাহেব বাঙ্গালী-বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিবার জন্য কলিকাতায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন; এবং কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে বিদ্যাসাগর ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি হ্যালিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০।৬০টী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে বড় মনোযোগ করিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়াদির তালিকা পাঠাইয়া দিলে গভর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইলেন; যাঁহার উৎসাহ-বাক্যে উৎ-সাহিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ এই বৃহৎ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া ছিলেন, সেই হ্যালিডে সাহেব ও

তখন নিশ্চিন্ত ও নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হইয়া স্বয়ং এসমস্ত ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যালয় গুলি কয়েক দিন চালাইয়া ছিলেন।

তৎকালে বিদ্যাসাগরের এক জন বন্ধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। যিনি যে কোন বিষয় তত্ত্ববোধিনীর জন্য লিখিয়া পাঠাইতেন, তিনি তাহা দেখিয়া দিতেন, পরে তাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইত। বিদ্যাসাগর ঐ বন্ধুর নিকট ইংরাজী আলোচনা করিতে যাইতেন এবং ঐ বন্ধুবরের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিয়া দিতেন। ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর লেখকগণ বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাইলেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়া তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুরোধ করেন; এবং স্বয়ং যে সকল গ্রন্থ লিখিতেন তাহাও বিদ্যাসাগরের দ্বারা সংশোধন করাইয়া প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের সাহায্যে অক্ষয়কুমারের রচনা-প্রণালী তত প্রাঞ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইনিই সর্ব্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন।* তৎকালে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের অনুরোধে তথায় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কোন বিশেষ কারণে তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব ত্যাগ করেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে, বিদ্যাসাগর নিজ জন্মভূমি

* বিদ্যাসাগর-বিরচিত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার অনুবাদ দেখিয়া তাঁহারই পরামর্শ মতে ও পণ্ডিতগণের সাহায্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বীরসিংহে তত্রত্য দরিদ্র বালক-বালিকাদিগের উপকারার্থ একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। রাখাল-বালকেরা সমস্ত দিন অবকাশ পাইত না বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য রাত্রিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর নিজ গ্রামে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কৃত-শিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব এবং বাঙ্গালীও ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হন। ইনি তৎকালীন অনেকানেক কৃতবিদ্যগণের মত খণ্ডন করেন; এবং যাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-শিক্ষার বহু প্রচার হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। বিদ্যাসাগরের আবেদন পত্র সাদরে গৃহীত হইল, এবং গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন। এই সময়ে যাহাতে সহজেই লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর সহজ সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন।

বিদ্যাসাগর কেবল স্ত্রী-শিক্ষা ও সাধারণ দরিদ্রগণের শিক্ষা-পক্ষে যত্নবান্ ছিলেন, এরূপ নহে। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। সেই সময়ে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বিধবাবিবাহের বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ইহাঁর শাস্ত্রপারদর্শিতা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। নিরপেক্ষ-ভাবে ইহাঁর মত গ্রহণ করিলে, এই মত অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সময়ে হিন্দুসমাজের অনেকানেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই

বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর দেশীয় লোকের গ্লানি, কুৎসা ও নিন্দাবাদ অকাতরে সহ্য করিয়া ও প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে স্মার্ত্তকুল-ভূষণ ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে ও চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট বিধবা-বিবাহ প্রচলনার্থ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫ আইন লিপি বদ্ধ করিলেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে কএকটী বিধবা-বিবাহ সমাধা হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সমাজের একটী বিশেষ হিতকর কার্য্যে মনোযোগ করেন। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; এই তামসিক কার্য্যে হিন্দুসমাজের কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার" নামে তিনি দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বহু বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন। কিন্তু তৎকালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট বহু-বিবাহ রহিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল ইন্স্পেক্টরের পদ পরিত্যাগ করেন।

কিছুদিন পরে নিজ তত্ত্বাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটান নামক একটী ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, যে বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। ইংরাজ ভিন্ন কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ ক্লাস খুলিলেন; এই কলেজ লইয়া ই. সি, বেলির সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ই. সি, বেলি বলেন, "বিদ্যাসাগর, আপনি কিরূপে নিজ কলেজ চালাইবেন? ইংরাজ-সাহায্য ভিন্ন ইংরাজী কলেজ চলিতে পারে না।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, তিনি আপন ছাত্রকে উত্তমরূপে ইংরাজী-বিদ্যা শিখাইতে ও পাস করাইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয়। ফলে তাহাই হইল। এখন ইহাঁর যত্নে স্থাপিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী বিদ্যালয় ও একটী কলেজ চলিতেছে।

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সুগম ছিল না, এবং তখন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার মত পরিশুদ্ধ হয় নাই। সাধারণে যাহাতে সহজেই বাঙ্গালাভাষা শিখিতে পারে, এই উদ্দেশে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

পুস্তকের নাম।	রচনাকাল।
বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ।
বাঙ্গালার ইতিহাস	১৮৪৮ ,,
জীবনচরিত	১৮৫০ ,,
বোধোদয়	১৮৫১ ,,
উপক্রমণিকা ব্যাকরণ	১৮৫২ ,,

পুস্তকের নাম।	রচনাকাল।
ঋজুপাঠ (তিন ভাগ)	১৮৫২ খৃষ্টাব্দ
ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ	১৮৫৩ ,,
ঐ ২য় ও ৩য় ভাগ	১৮৫৪ ,,
শকুন্তলা	১৮৫৫ ,,
বিধবা-বিবাহ ১ম ভাগ	১৮৫৬ ,,
ঐ ২য় ভাগ	ঐ ,,
বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)	ঐ ,,
কথামালা	ঐ ,,
সংস্কৃত সাহিত্য ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব	ঐ ,,
চরিতাবলী	১৮৫৭ ,,
মহাভারতের উপক্রমণিকা	১৮৬০ ,,
সীতার বনবাস	১৮৬২ ,,
ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ	১৮৬২ ,,
আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ	১৮৬৪ ,,
ঐ ২য় ভাগ	১৮৬৮ ,,
ঐ ৩য় ভাগ	ঐ
ভ্রান্তিবিলাস	১৮৭০ ,,
বহু-বিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কি না)	১৮৭২ ,,

বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই তাহার আদিও ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় লেখকগণ নানা ছাঁদে ও নানা ভাবে বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাহা বিদ্বান্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, কেবল তাহাই নয়। ইহাঁর পরোপকারিতা ও দানশীলতা বঙ্গদেশের মহা ধনবান্ হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলই অবগত আছেন। ইনি দেশীয় বিপন্ন, দরিদ্র ও বিধবাদিগকে প্রতিমাসে অনেক টাকা দিয়া থাকেন। ইনি প্রকাশ্যে কিছু দান করেন না; ইহাঁর দানকার্য্য গুপ্তভাবেই সম্পন্ন হয়। ইনি ধনাঢ্য না হইলেও বাহাত্তর মন্বন্তরের সময়ে বহু অর্থ বিতরণ করিয়া যেরূপে বীরসিংহের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করেন, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাতে বিদ্যাসাগরের উদার চরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে ইনি প্রায় ছয়মাসকাল বীরসিংহে প্রত্যহ সহস্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বস্ত্রহীন দরিদ্রদিগকে প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র দান করেন। ইহাঁর এই দানশীলতা ও পর-দুঃখ-কাতরতা আপন মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। শুনা যায়, ইহাঁর মাতা নাকি অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন. কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত; যে কোন প্রকারে হউক দুঃখীর দুঃখ দূর কবিতে প্রয়াস পাইতেন। সেই সদাশয়া জননীর যেরূপ নানা গুণ ছিল, বিদ্যাসাগরেরও সেই সকল গুণ দেখা যায়। ইনি বলেন,—"দরিদ্রের দুঃখ কয় জন দেখিয়াছে! তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয় জন বুঝিয়াছে!" বাস্তবিক দরিদ্রের দরিদ্র্য ও বিধবার দুঃখ দেখিলে নয়নজলে ইহাঁর বক্ষ ভাসিয়া যায়। দুঃখীর দুঃখ যখন কাহারও নিকট বর্ণনা করেন. তখনও তাঁহার অশ্রু পতিত হয়। এই কথাগুলি কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিও না। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

মুক্তকণ্ঠে বলিতে কি, এমন হৃদয়বান্ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইনি সামান্য রাখাল হইতে অতিবড় রাজা, সকলেরই বন্ধু। যে কেহ হউক, আপনার বিপদ বিদ্যাসাগরকে জানাইলে ইনি অর্থ দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, অপর লোকের সাহায্য দ্বারা, অথবা যে কোন উপায়ে হউক, সাধ্য মতে সেই ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথের নিকটে কর্ম্মাটাড নামে একটী স্থান আছে। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে গিয়া বাস করেন। ইনি এখানকার সাঁওতালদিগকে বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহঁাকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করে।

ইহাঁর হৃদয় ভক্তিময়, পিতামাতাকে ইনি ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতামাতাই ইহাঁর আরাধ্য দেবতা। যখন কেহ ইহাঁর কাছে পিতামাতার কথা উত্থাপন করেন, তখন দেখা গিয়াছে—পুলকে, ভক্তিতে ও তাঁহাদের অদর্শননিবন্ধন দুঃখে এই মহাত্মার হৃদয় প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে কি, ইনি একজন শাস্ত্রবিশারদ, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক ও দেশহিতৈসী মহাপুরুষ। অধিক কি, ইনি বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারের পিতাস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত সাতবৎসর হইতে ইনি পীড়িত। যে ব্যক্তি বৈদ্যবাটী হইতে বীরসিংহ গ্রামে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এখন তিনি বাটীর বাহির হইতে কষ্ট বোধ করেন। এখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই যে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিরজীবী করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে উপকৃত করুন!